মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR
রেজি: নং- ১৪৫ বর্ষ-৩, সংখ্যা-০৫

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

জুন ২০১৪ইং, শা'বান ১৪৩৫হি:, জ্যৈষ্ঠ ১৪২১বাং | شعبان المعظم ١٤٣٥ يونيو ٢٠١٤م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)
প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী
সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক
নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী জামাল উদ্দীন
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

বিনিময়: ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন: ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮
ইমেইল :monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :..... ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে : ৪
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৫
মাওয়ায়েযে ফক্বীহুল মিল্লাত :
ফুযালাদের প্রতি মূল্যবান নসীহত ৬
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ:
মহিলাদের নামায পুরুষদের নামায থেকে ভিন্ন ... ৮
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৫..... ১৩
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
শবে বরাত নিয়ে বাড়াবাড়ি কেন ১৮
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী
তাবলীগী কাজের সূচনা-৩ ..... ২৪
মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী
লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-২.. ৩১
সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাক্বিব ফয়জাবাদী কাসেমী
মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার .. ৩৮
মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৪
ইসলামে মানবাধিকার-৪ ..... ৪৭
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কোন্ পথে?

আঠারো শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপে অর্থনৈতিক বিপ্লবের পর পৃথিবীব্যাপী অর্থব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় কুফর এবং বদদ্বীনদের। তখন থেকে বদলাতে শুরু করে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা। প্রথম থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে দ্বীন ধর্মের অনুশীলন ও নিয়ন্ত্রণ ছিল। মানুষের ধ্যান-ধারণা আমানত, বিশ্বস্ততা ও সততার সুবাসে সুশোভিত ছিল। মানুষ সঠিক পন্থায় অর্থ উপার্জনে আত্মনিয়োজিত ছিল বটে, রাজ্জাকের ওপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখত। তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সচেষ্ট থকত সদাসর্বদা। কিন্তু আজ পৃথিবীর চিত্রই যেন পাল্টে গেছে। চতুর্দিকে কুফর এবং বস্তুতান্ত্রিকতার সয়লাব। পুরো অর্থব্যবস্থাটাই যেন ধর্মহীনতার হাতেই নিয়ন্ত্রিত। যার কারণে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা ও বিধি-বিধান সর্বোতভাবেই উপেক্ষিত। বৈধ-অবৈধ নির্বিবেচনায় শুধু অর্থ উপার্জনই যেন এখন সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বয়ং মুসলমানদের একটি বিশাল অংশ অর্থ উপার্জনের বেলায় ইসলামী বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলতে সামান্য ইতস্ততবোধ করে না। অনেকের অন্তরে এমন কথাও আসে যে (নাউজু বিল্লাহ) ইসলাম পরিপালন করতে গেলে অর্থ উপার্জন সম্ভব হবে না। এটি একটি ভ্রান্ত অহেতুক এবং অনর্থক চিন্তা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইসলাম তো এমন সর্বজনীন ও সামগ্রিক বিধি-বিধানের নাম, যার আলোক রশ্মি দুনিয়ার সকল বিভাগকে আলোকিত করে। সাধারণ লোক তো বটেই, মুসলমানদের বিশেষ শ্রেণী, এমনকি ধর্মীয়ভাবে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গও এখন অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের অগণিত পেরেশানি ও দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত। তারা এমন ব্যস্ত, রিযিকের বরকত ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জনে ইসলামের অমোঘ শিক্ষার প্রতি নজর ফেরানোরও সময় যেন তাদের নেই।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এমন বহু আমলের কথা বলা হয়েছে, যার দ্বারা রিযিকে বরকত হয়, মানুষের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জিত হয়, ধনাঢ্য এবং সম্পদশালীও হওয়া যায়।

যেমন–তাওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে রিযিক বৃদ্ধিপায় (সূরা নূহ ১০-১১, হুদ ৫২, আবু দাউদ ১৫১৮) তাকওয়া পরহেযগারী গ্রহণ করলে রিযিকে বরকত হয়, (সূরা তালাক ২-৩, আরাফ ৯৬, মায়েদা ৬৬), খুশু খুযুর সাথে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হলে অভাব দূর হয়ে যায়। (ইবনে মাজাহ ৪১০৭), আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল তথা পুরোপুরি ভরসা করলে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। (তালাক ৩, মুসনাদে আহমদ ২০৫), আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলে তার পরবর্তীতেই এর চেয় উত্তম বদলা পাওয়া যায়। (সূরা সাবা ৩৯, ইবনে মাজাহ ২১২৩), আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের হক আদায় করলে রিযিক প্রশস্ত হয়। (সহীহে বুখারী কিতাবুল আদব ৫৯৮৫), দুর্বলের সাথে ভালো আচরণ করলে রিযিকে বরকত হয়। (মুসনাদে আহমদ ৫/১৯৮, আবু দাউদ ২৫৯১, তিরমিযী ১৭৫৪), বারবার হজ-উমরা পালন করলে গোনাহ নিঃশেষ হয় রিযিকও বৃদ্ধি পায়। (মুসনাদে আহমদ ৭৩৬৬৯, তিরমিযী ৮০৭), আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করলে জীবনোপকরণ প্রশস্ত হয়। (সূরা নিসা ১০০)

পরকালীন জীবনে তো আছেই, পার্থিব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ, জীবনোপকরণে সচ্ছলতা অর্জন ও সম্পদশালী হওয়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাতলানো কিছু পথ ও পন্থা হলো উল্লেখিত বিষয়গুলো। একজন মুসলমানের জন্য তার অর্থনৈতিক জীবনেও সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস এসবের ওপর থাকতে হবে এবং বাস্তব জীবনে এসবের চর্চাই অধিক হতে হবে।

কুরআন-হাদীসের এ সকল দিকনির্দেশনার ওপর জীবন পরিচালনা করতে পারলে নিশ্চয়ই তাদের অভাব-অনটন, মুখাপেক্ষিতা দূর হয়ে যাবে। অন্তর স্থিতিশীল হবে ও পেরেশানিমুক্ত হবে।

দ্বীনি যেসব বিষয় সাধারণ মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য ও প্রয়োজন, সেগুলো বিশেষ ব্যক্তিবর্গ তথা সমাজের শিক্ষিত শ্রেণী, সৎব্যক্তি, সমাজের নেতৃত্বদানকারী ও উলামায়ে কেরামের বেলায় আরো বেশি প্রয়োজন। যেমন ধরুন, উলামায়ে কেরাম ইসলামের বাস্তব আদর্শ অনুশীলনে মুসলমানদের জন্য নমুনা। ইবাদতে যেমন তারা সাধারণ মুসলমানগণের জন্য নমুনা, মুআমালাত মুআশারাত তথা ইসলামসম্মত অর্থনৈতিক, সামাজিক এমনকি ব্যক্তিগত বিষয়াদির ক্ষেত্রেও নমুনা।

হালাল উপার্জন, হারাম বর্জন। ধোঁকা-প্রতারণামুক্ত স্বাভাবিক জীবনযাপন, যা ক্রমান্বয়ে 'আকাশ কুসুমে' রূপান্তরিত হতে চলছে। সামষ্টিক-সামগ্রিক জীবনকে এভাবে সাজাতে হলে সাধারণ মুসলমানদেরকে কুফর এবং বেদিনদের চিন্তা-চেতনা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে হবে। সমাজের বিশেষ ব্যক্তিবর্গ যেমন হক্কানী ওলী, বুজুর্গ ও উলামায়ে কেরামের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। আবার বিশেষ ব্যক্তিবর্গদেরও তাদের পদচারণার ক্ষেত্রে বদদ্বীনদের চিন্তা-চেতনায় ভাসিয়ে দিলে চলবে না বরং সতর্ক ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যাতে তারা যেন অনুসরণযোগ্যতা হারিয়ে না বসে। তাদের প্রতি যেন সাধারণ মুসলমানদের বিশ্বাস এবং আস্থা অটুট থাকে।

আরশাদ রহমানী, ঢাকা।
২৫-০৫-২০১৪

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٦) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

(১) যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, (২) যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে (৩) এবং মানুষ বলবে, এর কি হল? (৪) সে দিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে (৫) কারণ আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। (৬) সে দিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে। যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। (৭) অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। (৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا আয়াতে প্রথম শিংগা ফুঁকার পূর্বেকার ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। প্রথম ফুৎকারের পূর্বেকার ভূকম্পন কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে গণ্য হয় এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পনের পর মৃতরা জীবিত হয়ে কবর থেকে উত্থিত হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে ও তাফসীরবিদগণের উক্তি এ ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ যে, আলোচ্য আয়াতে কোন ভূকম্পন ব্যক্ত হয়েছে। তবে এ স্থলে দ্বিতীয় ভূকম্পন বোঝানোর সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ এরপর কিয়ামতের অবস্থা তথা হিসাব নিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (মাযহারী)

واخرجت الارض اثقالها এই ভূকম্পন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিশালকায় স্বর্ণখণ্ডের আকারে উদগীরণ করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধনসম্পদের জন্য কাউকে হত্যা করেছিল তা দেখে বলবে, এর জন্যই কি আমি এতবড় অপরাধ করেছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছেদ করেছিল, সে বলবে এর জন্যই কি আমি একাণ্ড করেছিলাম? চুরির কারণে যার হাত কাটা হয়েছিল, সে বলবে এর জন্যই কি আমি নিজের হাত হারিয়ে ছিলাম? অতঃপর কেউ এসব স্বর্ণখণ্ডের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবে না। (মুসলিম)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه আয়াতে خير বলে শরীয়তসম্মত সৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে। যা ঈমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা, ঈমান ব্যতীত কোনো সৎকর্মই আল্লাহর কাছে সৎ কর্ম নয়। কুফর অবস্থায় কৃত সৎ কর্ম পরকালে ধর্তব্য হবে না যদিও দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেওয়া হয়। তাই এ আয়াতকে এ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় যে, যার মধ্যে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে অবশেষে জাহান্নম থেকে বের করে নেওয়া হবে। কেননা, এ আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী প্রত্যেকের সৎ কর্মের ফল পরকালে পাওয়া জরুরী। কোনো সৎ কর্ম না থাকলেও স্বয়ং ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে মু'মিন ব্যক্তি যত বড় গোনাহগার হোক, চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিন্তু কাফির ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো সৎ কর্ম করে থাকলেও ঈমানের অভাবে তা পশুশ্রম মাত্র। তাই পরকালে তার কোনো সৎ কাজই থাকবে না।

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه জীবদ্দশায় তওবা করেনি এখানে এমন অসৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে। কেননা, কুরআন ও হাদীসে অকাট্য প্রমাণ আছে যে, তওবা করলে গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে যে গোনাহ থেকে তওবা করেনি, তা ছোট হোক কিংবা বড়, পরকালে অবশ্যই তা সামনে আসবে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আয়েশা (রা.) কে বলেছিলেন, দেখ এমন গোনাহ থেকেও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও, যাকে ছোট ও তুচ্ছ করা হয়। কেননা, এর জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হবে। (নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) বলেন, কুরআনের এ আয়াতটি সর্বাধিক অটল ও ব্যাপক অর্থবোধক। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ আয়াতকে 'একক অনন্য ও সর্বব্যাপক' বলে অভিহিত করেছেন।

হযরত আনাস (রা.) ও ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূরা যিলযালকে কুরআনের অর্ধেক, সূরা ইখলাসকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরুনকে কুরআনের এক চতুর্থাংশ বলেছেন। (মাযহারী)

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

ঈমানের কয়েকটি লক্ষণ

عن ابى امامة ان رجلا سأل رسول الله ﷺ ما الايمان ؟ قال اذا سرتك حسنتك وساءك سيئتك فانت مؤمن

হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমানের নিদর্শন কী? তিনি উত্তরে বললেন, তোমার পুণ্য কাজ যখন তোমাকে আনন্দ দান করে আর তোমার মন্দ কাজ যখন তোমাকে দুঃখ দেয়, তখন মনে করে নাও যে, তুমি মুমিন। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা :

হাদীসটির মর্ম এই যে, ঈমানের বিশেষ প্রভাব ও নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটিও একটি নিদর্শন যে, মানুষ যখন কোনো ভালো কাজ করে, তখন সে মনে আনন্দ অনুভব করে। আর যখন তার পক্ষ থেকে কোনো গুনাহ ও মন্দ কাজ সংঘটিত হয়ে যায়, তখন সে অন্তরে দুঃখ ও ব্যথা অনুভব করে। যে পর্যন্ত মানুষের বিবেকের মধ্যে এই অনুভূতি অবশিষ্ট থাকবে, বুঝতে হবে, ঈমানী আত্মা এখনও জীবিত আছে। আর এই অনুভূতিটি এরই ফল ও ফসল।

ঈমানকে পূর্ণতা দানকারী উপাদানসমূহ :

عن عباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله ﷺ يقول ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا۔

হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন, ঈমানের স্বাদ ওই ব্যক্তি পেয়েছে, যে আল্লাহকে নিজের রব, ইসলামকে নিজের দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নিজের রাসূল ও পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিতে রাজি হয়েছে। (সহীহে মুসলিম)

ব্যাখ্যা :

এ বিষয়টি এভাবে বুঝে নেওয়া উচিত যে, সুস্বাদু ও মজাদার খাবারসমূহে যেমন বিশেষ স্বাদ থাকে, আর এ স্বাদ ও মজা কেবল ওই ব্যক্তিই লাভ করতে পারে, যার আস্বাদনশক্তি কোনো রোগের কারণে নষ্ট হয়ে যায়নি, তদ্রূপভাবে ঈমানের মধ্যেও এক বিশেষ স্বাদ ও মজা রয়েছে। কিন্তু এ ঈমানী স্বাদ কেবল ওই সব ভাগ্যবান লোকই লাভ করতে পারবে, যারা মনের খুশি ও অন্তরের সন্তুষ্টির সাথে আল্লাহকে নিজের প্রভু পরওয়ারদেগার, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আপন নবী ও রাসূল এবং দ্বীন ইসলামকে নিজের দ্বীন ও জীবন বিধান বানিয়ে নিয়েছে। যাদের অন্তর আল্লাহর গোলামী, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর আনুগত্য এবং ইসলামী জীবনধারার অনুসরণকে আপন করে নিয়েছে। অর্থাৎ ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্ক কেবল প্রথাগত কিংবা পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত বস্তুর মতো অথবা কেবল জ্ঞানগত ও বুদ্ধিগত হলেই চলবে না, বরং এগুলোর সাথে আন্তরিক বশ্যতা ও প্রেমও থাকতে হবে। এ কথাটিই হাদীসে রাজি হয়ে গিয়েছে শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। যার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত, তার জন্য ঈমানী স্বাদ ও মজারও কোনো অংশ নেই। আর তার ঈমানও পরিপূর্ণ নয়।

عن انسؓ قال قال رسول الله ﷺ ثلث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود فى الكفر كما يكره ان يقذف فى النار۔

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ঈমানের স্বাদ সে ব্যক্তিই পাবে, যার মধ্যে তিনটি বিষয় পাওয়া যাবে। ১. আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ভালোবাসা তার কাছে সকল জিনিসের চেয়ে বেশি হওয়া। ২. যার সাথেই তার ভালোবাসা হবে তা কেবল আল্লাহর জন্যই। ৩. ঈমানের পর কুফরীতে ফিরে যাওয়া আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দনীয় হওয়া। (সহীহে বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা :

এই হাদীসটির বিষয়বস্তুও প্রায় পূর্ববর্তী হাদীসের মতো, কেবল বর্ণনাভঙ্গির সামান্য পার্থক্য রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, ঈমানের স্বাদ সে ব্যক্তিই লাভ করতে পারবে, যে আল্লাহ এবং রাসূলের ভালোবাসায় এমন মত্ত হয়ে যায় যে, আল্লাহ এবং রাসূলের ভালোবাসা সব কিছুর চেয়ে প্রবল থাকে এবং এ ভালোবাসা এমন একচ্ছত্রভাবে তার অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে যায় যে, সে যদি অন্য কাউকেও ভালোবাসতে চায় তাহলে সেটাও আল্লাহর জন্য করে থাকে। আর আল্লাহর দ্বীন ইসলাম তার কাছে এমন প্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়ে যায় যে, সেখান থেকে ফিরে আসার কল্পনাও তার কাছে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো কষ্টদায়ক মনে হয়।

আরেকটি হাদীসে আছে–

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তিই মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি আমার আনীত হেদায়াতের বশীভূত না হয়ে যায়। (শরহুস সুন্নাহ)

ব্যাখ্যা :

এই হাদীসে প্রবৃত্তিকে বশীভূত করাকে ঈমানের শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। খারাপ কাজে যেমন প্রবৃত্তির চাহিদা থাকে তা যেমন বশীভূত করতে হবে। স্বয়ং দ্বীনকেও নিজের প্রবৃত্তির উর্ধ্বে রাখতে হবে। প্রবৃত্তি যেটা চায় সেরূপে দ্বীন পালন করাও এই হাদীসের মর্মার্থ অনুযায়ী নিষিদ্ধ।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা
শাহ আবরারুল হক্ব হক্বী হারদূয়ী (রহ.)-এর
অমূল্য বাণী

আমি তো পন্থা বাতলে দিচ্ছি, আপনারা তা বাস্তবায়ন করে দেখুন :
প্রত্যেকে নিজেদের মসজিদে এরূপ একটা ধারা জারি করুন। মাদরাসার উস্তাদগণ ছাত্রদের এসব কথা শিখিয়ে দিন এবং মুখস্ত করিয়ে দিন। মসজিদে যে সকল আমল-আখলাক এবং সুন্নাতের কথা বড়রা শ্রবণ করছেন ঘরে গিয়ে নিজের স্ত্রী, বোন ও কন্যাদেরকে শোনান। তাতে সুন্নাতের প্রসার হবে, সুন্নাত জিন্দা হবে এবং সকলে জানতে পারবে-শিখতে পারবে। যখন এসব সুন্নাতের কথা চতুর্দিকে চর্চিত হতে থাকবে মসজিদ-মক্তব-ঘরে, প্রত্যেক স্থানে যখন এসব কথার চর্চা শুরু হয়ে যাবে ময়লা-আবর্জনা-জুলমাত এমনিতেই চলে যেতে থাকবে। ময়লার ওপর যখন পরিষ্কার পানি ঢালা হয় সব ধরনের ময়লা দূর হয়ে যায়, আলো জ্বলে উঠলেই আঁধার কেটে যায়। সে কারণে সুন্নাতের গুরুত্ব দিন। রাসূল (সা.)-এর তরীকা-পন্থা অবলম্বন করেন। তখন মাহবুব হওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হবে। রাসূল (সা.) মাহবুব ছিলেন, তাঁরই তরীকা মতে চললে নিজের মধ্যেও মাহবূবিয়্যাতের যোগ্যতা পয়দা হবে।

تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں
حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں

যখন সুন্নাতের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবেন বরকাত হাসিল হবে।

কুরআন ও সুন্নাহের ওপর আমল করার উপকার :
এই জামানয়ও যারা সুন্নাতে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওপর পরিপূর্ণ চলে থাকেন তাঁদের মাহবুব হওয়ার কেমন যোগ্যতা! যাদেরকে আপনারা আকাবের উম্মত ও মাশায়েখ বলে থাকেন। তারাই তো পবিত্র কুরআন-সুন্নাত অনুসারে আমলকারী। যার কারণে তাঁরা সম্মান ও ইজ্জতের পাত্র হয়ে থাকে। মানুষের মাঝে তাদের গ্রহণযোগ্যতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কিরূপে বৃদ্ধি পায়! সুতরাং সুন্নাতকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আবশ্যক করে নাও। আল্লাহ তা'আলা এর বরকতে দুনিয়া ও আখেরাতে ইজ্জত নসীব করবেন।

দ্বীনি তালীম ও তারবিয়াতের গুরুত্ব :
আমাদের দেশে ছোট-বড় দ্বীনি মাদরাসা ও মক্তবের একটি দীর্ঘ ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, যা অমুখাপেক্ষিতা, মিতব্যয় এবং তাওয়াক্কুলকে নিজেদের পুঁজি মনে করে দ্বীনি তালীম ও তরবিয়াতের গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। এ সকল মাদরাসা ইসলামের যাথযথ চাহিদা ও কীর্তিকে শুধু সংরক্ষণই করছে না বরং মিল্লাতের কোটি কোটি সদস্য এবং আগন্তুক প্রজন্মকে ইসলামী তাহজীব তামাদ্দুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইসলামী জীবন গঠনে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এটি ইতিহাসের এক স্বর্ণালি অধ্যায়। এতদ্সত্ত্বেও কিছু কিছু বন্ধু দ্বীনি মাদরাসাসমূহের এমন উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করতে চান না। সে কারণে তাদের একটি চেষ্টা হলো মাদরাসাসমূহকে আধুনিক শিক্ষার জন্য ব্যবহার করা।

এ বিষয়ে হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন–

নিঃসন্দেহে বর্তমানে দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব মুসলমানদের জন্য এত বড় নিয়ামত যে, এর ওপর আর কোনো মূল্যবান উদ্দেশ্য হতেই পারে না। দুনিয়াতে যদি ইসলামের টিকে থাকার কোনো ব্যবস্থা থাকে তবে সেটা এসব মাদরাসার মাধ্যমেই আছে। কারণ ইসলাম সঠিক আকিদা এবং আমলের নাম। যার মধ্যে আমানতদারি, লেনদেন, সমাজব্যবস্থা এবং চারিত্রিক শিক্ষা সবই অন্তর্ভুক্ত। আমল ইলমের ওপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক অবস্থায় সঠিক দ্বীন অর্জনের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হলো মাদরাসা। সুতরাং ইসলাম সঠিকভাবে টিকে থাকার জন্য কওমী মাদরাসার বিকল্প নেই।

আরেক স্থানে লেখেন, মাদরাসাসমূহে বেকার পড়ে থাকাও অন্যান্য শিক্ষার চেয়ে অনেকগুণ উপকারী। কারণ ইলমের যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলেও আকীদা নষ্ট হবে না। মসজিদের প্রতিবেশী হওয়া দুনিয়াবী এমন বড় বড় পদ থেকেও উত্তম যে পদে থাকাকালীন ঈমানের ক্ষতি হয়, আকীদা নষ্ট হয়, আল্লাহ, রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা সৃষ্টি হয়।

তবে যাদের অন্তরে দ্বীনের অবসান ঘটলেও কোনো পেরেশানি থাকে না, যাচ্ছেতাই করে বেড়ায় তাদের কথা ভিন্ন। (তারা মাদরাসা মসজিদের গুরুত্বই বা কী বুঝবে)।

খানেকাহে এমদাদিয়া
আশরাফিয়া আবরারিয়ার
বার্ষিক ইসলাহী ইজতিমা
২৫,২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ইং
২ ,৩ রবিউল আওয়াল ১৪৩৬ হি.
বৃহস্পতি ও শুক্রবার
স্থান: জামে মসজিদ, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

ফুযালাদের প্রতি মূল্যবান নসীহত

আলহামদু লিল্লাহ, দীর্ঘ মেহনতের পর আজ অনেকেই দরসী সালকে আল বেদা বলার জন্য প্রস্তুত। এই সময় যেকোনো দ্বীনি জামি'আতে সমাপনী বর্ষের বিশেষ করে দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রদের আবেগ-অনুভূতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানার চেষ্টা করলে দেখা যাবে তাদের চিন্তাধারা ও মনোভাব এক নয়।

ফুযালাদের মনোভাব :

১। অনেক ফুযালাদের দেখা যায় সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত।

২। অনেককে দেখা যায় যারপরনাই অস্থির দোদুল্যমান।

৩। অনেকে শিক্ষার দীর্ঘ সফরকে এখানেই শেষ করার জন্য বদ্ধপরিকর।

৪। আবার অনেকে আরো শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতিতে মগ্ন।

৫। অনেকে নিজেকে পরিস্থিতির ওপর ছেড়ে দেয় 'যা হবার হবে'। মূলত তারা উদ্দেশ্যহীন সিদ্ধান্তহীন।

৬। কিছুসংখ্যক ফুযালা এমনও রয়েছে, যারা নিজেদের ব্যাপারে যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সম্পূর্ণভাবে নিজের অভিভাবক ও উস্তাদদের হাতে ন্যস্ত করে থাকে।

৭। এক শ্রেণীর ফুযালা এমনও রয়েছে, যাদের চাহিদা, আকর্ষণ, অনুরাগ নিজেদের উস্তাদদের চাহিদা ও ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী। এ ধরনের ফুযালারা সধারণত অন্যদের তুলনায় বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়।

তবুও একই সুতায় গাঁথা :

শিক্ষার শেষ প্রান্তে এসে অধিকাংশ ফুযালার চিন্তা-চেতনা ভিন্ন ভিন্ন ধারা বটে। তবু আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের চিন্তা-চেতনা এক অভিন্ন এবং এক সুতায় গাঁথা। যেমন ব্যক্তিগতভাবে যেকোনো চেতনার লালনকারীই হোক না কেন সর্বাবস্থায় উস্তাদদের মতামত ও সিদ্ধান্তকেই প্রাধান্য দেবে এবং মনেপ্রাণে মেনে নেবে।

২। নিজের প্রতিষ্ঠান ও মাদরে ইলমীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং মিশনের বাস্তবায়নে নিজেকে ফানা করে দিতে সদা প্রস্তুত।

৩। তাদের অধিকাংশই নিজের জীবন ও অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য দ্বীনের খিদমত, প্রচার-প্রসার এবং দ্বীনের ওপর অশুভ আক্রমণকে প্রতিহত করা মনে করে।

৪। কারবার, পদ-পদবি এবং দুনিয়ামুখী হওয়া তাদের পছন্দের তালিকাবহির্ভূত।

তিনটি পরামর্শ :

শিক্ষার শেষ ধাপে এসে ফুযালাদের এই মুহূর্তটি বড়ই কঠিন। প্রত্যেক ফাযেলের অন্তরেই লুকায়িত থাকে ভবিষ্যতের ব্যাপারে প্রশ্ন। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব ফুযালাদের সার্বিক অবস্থার বিবেচনায় তাদের সামনে তিনটি কথা পেশ করছি।

মূলত একজন ফাযেলকে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণে করতে হবে পরামর্শ। এরপর নিতে হবে সিদ্ধান্ত। পরামর্শ থেকে সিদ্ধান্ত পর্যন্ত পৌঁছাতে খুঁজতে হবে তিনটি প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন ১.

একজন ফাযেলের জন্য পরামর্শ করার আগে কী করতে হবে?

উত্তর খুব সহজ। পরামর্শ করার আগে পরামর্শের প্রস্তুতি নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সাধারণত ফুযালারা একটি ভুলের শিকার হয়। তারা মনে করে তাসলীম, রেজা এবং উস্তাদদের ওপর আস্থার উদ্দেশ্য হলো নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বয়ং নিজে কোনো ধরনের চিন্তা-ভাবনা করা যাবে না। এ ধরনের আবেগী মনোভাব নিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা মোটেই ঠিক নয়। আরে ভাই! নিজের ব্যাপারে নিজের যতটুকু জ্ঞান আছে, অন্যজন তা কিভাবে জানবে। আর জানলেই বা কতটুকু জানবে? তুমি তোমার পরিবেশ-পরিস্থিতি, জরুরত, হাজত, সমস্যা, যোগ্যতা, আগ্রহ এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে খুব ভেবেচিন্তে নির্ণয় করো তোমাকে কী করতে হবে এবং কী বনতে হবে। তাদরীস, তাখাসসুস নাকি অন্য কিছু? প্রথমেই নিজের লক্ষ্য স্থির করে ভবিষ্যৎ কর্মের একটি খসড়া তৈরি করে নাও। অতঃপর স্তরবিন্যাস করে নিজের জন্য সর্বাধিক প্রযোজ্য দিকটি নির্ণয় করো। এই ধাপ অতিক্রম করার পরই তুমি পরামর্শ করার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এবার তুমি তোমার মুহতারাম উস্তাদের সামনে নিজের চাহিদা আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাধান্য দেয়া বিষয়গুলো পেশ করো। সব দিক সামনে রেখে তিনি যখন পরামর্শ দেবেন আশা করি তা ফলপ্রসূ হবে।

প্রশ্ন ২.

পরামর্শ কার সাথে করবে?

বাস্তব সত্য হলো, প্রত্যেক উস্তাদ ছাত্রদের প্রতি স্নেহশীল এবং দয়ালু হন। কিন্তু ব্যাপারটি যেহেতু তোমার ভবিষ্যতের ভিত্তি নিয়ে। তাই পরামর্শক তোমাকেই ঠিক করতে হবে। তবে তা ভেবেচিন্তে হতে হবে। শুধুমাত্র আকীদত মুহাব্বত দিয়ে নয়। কান পেতে খুব

গুরুত্বসহ শোন, পরামর্শ তার সাথেই করবে, যার মধ্যে তিনটি গুণ পাওয়া যাবে।

১। মুশীর তথা পরামর্শদাতা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে সার্বিকভাবে অবগত হতে হবে। তা তোমার জানানোর মাধ্যমেই হোক না কেন।

২। তুমি যে ব্যাপারে পরামর্শ নিতে চাও তিনি সে ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার যোগ্য হতে হবে। যেমন ইসলামী অর্থনীতির ওপর কোর্স করা অতি প্রয়োজনীয় এবং যুগোপযোগীও বটে। এ ব্যাপারে যিনি সম্যক অবগত নন তার কাছে পরামর্শ চাইলে তা কখনো ফলপ্রসূ হবে না।

৩। যেমনিভাবে মুশীরের প্রতি তোমার আকীদত মুহব্বত থাকা প্রয়োজন তেমনি তোমার প্রতিও তিনি স্নেহশীল হওয়া আবশ্যক।

উপরোল্লিখিত তিনটি গুণের একটিও যদি কোনো মুশীরের মধ্যে অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার সাথে পরামর্শ করা নিরর্থক হবে। ভেস্তে যাবে তোমার যাবতীয় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। নড়বড়ে হয়ে যাবে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত। অতএব তুমি তোমার ব্যাপারে যা জান তদানুযায়ী তোমাকেই উপযুক্ত মুশীর নির্বাচন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত মূলনীতিগুলো সামনে রেখে অগ্রসর হলে ইনশাআল্লাহ কখনো অনুতপ্ত হতে হবে না।

প্রশ্ন ৩.

পরামর্শ করার পর কী করতে হবে?

উত্তর সহজ, তাহলো পরামর্শের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখা। কারণ তুমি পরামর্শের যাবতীয় মূলনীতি মেনে যখন মুশীর ঠিক করবে, তখন তার মতামত ও পরামর্শের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখাই হবে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতা।

আকাবিরের সাথে জুড়ে থাকা :

এত দিন তোমরা উস্তাদদের স্নেহতলে ছিলে। এখন মাদরাসার চার দেয়াল ছেড়ে বের হলেই দেখবে চারদিকে অসংখ্য ফেতনার কালবৈশাখী ঝড়, গোমরাহীর নতুন নতুন ধরন সমাজে বিস্তার লাভ করছে। ধেয়ে আসছে অসংখ্য ইলমী, ফিকরী এবং মালের ফেতনা।

বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় আকাবির বুজর্গদের সাথে জুড়ে থাকা। নওজোয়ান ফুযালাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ভয়ানক ফেতনার কারণ আকাবিরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা। আমার সামনে এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যে, বিকৃত দর্শনের ধবজাধারীরা অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন ফুযালাকে আকাবিরের পথ থেকে হটিয়ে পথভ্রষ্ট করে অন্যকে পথভ্রষ্ট করার জন্য ময়দানে ছেড়ে দিয়েছে। অতএব তোমাদের কর্মক্ষেত্র যাই হোক, যেখানেই হোক, দৃঢ়ভাবে আকাবিরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে। ইনশাআল্লাহ সফলকাম হবে।

আত্মশুদ্ধির পথে মাসিক আল-আবরারের স্বার্থক দিকনির্দেশনা অব্যাহত থাকুক

টাইলস এবং সেনিটারী সামগ্রীর বিশ্বস্ত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

Importers & General Marchant of Sanitary Goods & Bath Room Fittings

J.K SANITARY

Shop # 10, Green Super Market (Ground Floor) Green Road Dhaka 1205, Bangladesh
Tel : 0088-02-9135987 Fax : 0088-02-8121538 Mobile : 0088-01675 209494, 01819 270797
E-mail: taosif07@gmail.com

Rainbow Tiles

2, Link Road, Nurzahan Tower, Shop No: 09
80/20 Mymansing Road, Dhaka, Bangladesh
Tel : 0088-02-9612039,
Mobile : 01674622744, 01611527232
E-mail: taosif07@gmail.com

Monalisa Tiles

25/2 Bir Uttam C.R. Dutta Road
Hatirpool, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: taosif07@gmail.com
Tel: 0088-029662424,
Mobile: 01675303592, 01711527232

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

মহিলাদের নামায পুরুষদের নামায থেকে ভিন্ন

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ একটি ধর্ম, সূরা মায়িদার তিন নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সে কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন, ইরশাদ হচ্ছে, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং আমার নেয়ামতও পূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে পছন্দ করলাম।'

তাই ইসলামের সব বিষয়ে নির্দিষ্ট হুকুম রয়েছে। অন্য বিষয়গুলোর মতো পুরুষ-মহিলার নামাযের পদ্ধতিগত পার্থক্যের বিষয়টিও এর ব্যত্যয় নয়। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যমানা থেকে সকলে এ পার্থক্য মেনে তদানুযায়ী নামায আদায় করতেন। বরং ঐকমত্যে পার্থক্যের বিপরীতে নতুন পদ্ধতি সামনে আসলে তা নিঃসংকোচে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন, যাতে মানুষ ধোঁকায় না পড়ে। যেমন ইমাম বুখারী (রহ.) 'তারীখে সগীরে' উম্মে দারদা (রাযি.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেন যে, 'তিনি নামাযে পুরুষদের মতো বসতেন' কিন্তু বর্তমান যমানায় ঐকমত্য সে বিষয়টি নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত নীতির গবেষকগণ মতানৈক্য দাঁড় করিয়েছে। তাই নারী-পুরুষের নামাযের পার্থক্যের বিষয়ে দালিলিক আলোচনা উম্মতের সামনে পেশ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

মূলকথা হলো, পুরুষ-মহিলার মাঝে মৌলিক যে তিনটি পার্থক্য করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো, অবস্থান ও কর্মস্থলের পার্থক্য। পুরুষের কর্মস্থল বাহিরে আর নারী গোপনীয় জিনিস।

عن ابن مسعود قال :ان المرأة عورة , وانها اذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان فتقول :مارأنى احد الا اعجبته ,واقرب ما تكون الى الله اذا كانت فى قعر يرتها .المعجم الكبير ٩/٢٩٥)

আর এই মৌলিক পার্থক্যের কারণে মূলত মহিলার নামায পুরুষ থেকে ভিন্ন রাখা হয়েছে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যমানা থেকে সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনগণ বিষয়টি খুব সহজভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃকও নির্দেশিত মহিলাদের নামাযের পার্থক্য অকপটে মেনে নিয়েছেন। এমনকি ইমাম চতুষ্টয় এই পার্থক্যের ব্যাপারে একমত। বাইহাকী (রহ.) বিষয়টি সুনানে কুবরায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, নামাযের বিভিন্ন বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলার নামাযে পদ্ধতিগত ভিন্নতার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো 'সতর' অর্থাৎ মহিলার জন্য শরীয়তের হুকুম হলো : ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করা, যা তাকে সর্বাধিক পর্দা দান করে। (সুনানে কুবরা)

মৌলিকভাবে মহিলার নামাযে পুরুষ থেকে চার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে :

১.তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো।

২. হাত বাঁধার স্থান।

৩. রুকুতে সামান্য ঝোঁকা।

৪. সিজদা জড়সড় হয়ে করা।

৫. বৈঠকে পার্থক্য।

প্রথম পার্থক্য : তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো।

عن وائل بن حجر قال :جئت النبى صلى الله عليه وسلم فقال :فساق الحديث .وفيه :ياوائل بن حجر اذا صليت فاجعل يديك حذاء اذنيك و المرأة تجعل يدها حذاء ثدييها .رواه الطبرانى فى الكبير ٢٢/١٩، ٢٠ قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢/٢٧٢) رواه الطبرانى فى حديث طويل فى مناقب وائل من طريق مينونة عن عمتها ام يحيى بنت عبد الجبار ,ولم اعرفها . وبقية رجاله ثقات.

১. 'ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলাম, তিনি আমাকে বললেন : হে ওয়ায়েল ইবনে হুজর! যখন তুমি নামায পড়বে তখন তুমি তোমার হাত কান পর্যন্ত উঠাবে আর মহিলারা তাদের হাত বুকের ওপর বাঁধবে।

হাইসামী (রাহ.) বলেন, 'এই হাদীসের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য উম্মে ইয়াহইয়া ব্যতীত।' কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের নিকট উম্মে ইয়াহইয়াও প্রসিদ্ধ।

عن الزهرى ,قال :ترفع يديها حذومنكبيها .المصنف لابن ابى شيبة ١/٢٠

২. 'ইমাম যুহরী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মহিলারা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে। (মুসান্নাফে ইবেন আবী শাইবা : ১/২৭০)

দ্বিতীয় পার্থক্য : হাত বাঁধা।

عن الطحاوى :المرأة تضع يديها على صدرها لان ذالك استر لها.

ওপর রাখে, আর যখন সিজদা করবে, তখন যেন পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে, যা তার সতরের জন্য অধিক উপযুক্ত হয়। (সুনানে কুবরা বাইহাকী : ২/২২৩)

عن خالد بن اللجلاج قال :كن النساء يؤمرن ان يتربعن اذا جلسن فى الصلوة ولا يجلسن جلوس الرجال على اوراكهن ,يتقى ذالك على المرأة مخافة ان يكون منها الشيء (المصنف لابن ابى شيبة ١/٣٠٣)

'হযরত খালেদ ইবনে লাজলাজ (রহ.) বলেন যে, মহিলাদেরকে আদেশ করা হতো তারা যেন নামাযে দুই পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের ওপর বসে, পুরুষদের মতো না বসে, আবরণীয় কোনো কিছু প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশংকায় মহিলাদেরকে এমনটি করতে হয়। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১/৩০৩)

عن ابن عباس :تجتمع و تحتفز (المصنف لابن ابى شيبة ١/٣٠٢)

'ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, মহিলারা কিভাবে নামায আদায় করবে? তিনি বললেন, খুব জড়সড় হয়ে অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামায আদায় করবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১/৩০২)

উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা একটু মনোযোগের সাথে পাঠ করলে একজন ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের পাঠক সহজে অনুমান করতে সক্ষম হবে যে, মহিলাদের নামাযের পার্থক্যের বিষয়টি নবীজি (সা.) এবং সাহাবীদের যুগ থেকেই চলে আছসে এবং এর পক্ষে অনেক শক্তিশালী দলিল রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ(?) সালাফ থেকে চলে আসা সুপ্রতিষ্ঠিত মত ও পথকে উপেক্ষা করে নিজের গবেষণালব্ধ মত ও সম্পর্কে গায়রে মুকাল্লিদদের বিখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান 'আউনুল বারী'১/৫২০ এ লিখেছেন, এই মুরসাল হাদীসটি সকল ইমামের উসূল ও মূলনীতি অনুযায়ী দলিল হওয়ার যোগ্য।

عن مجاهد بن جبر :انه كان يكره ان يضع الرجل بطنه على فخذيه اذا سجد كما تضع المرأة (المصنف لابن ابى شيبة ١/٣٠٣)

'হযরত মুজাহিদ ইবনে জাবর (রহ.) পুরুষদের জন্য মহিলাদের মতো উরুর সাথে পেট লাগিয়ে সিজদা করাকে অপছন্দ করতেন। (মুসান্নাফে ইবেন আবী শাইবা : ১/৩০৩)

عن الحسن وقتادة قالا :اذا سجدت المرأة فانها تنضم ما استطاعت ولا تتجافى لكى لاترفع عجيزتها (المصنف لابن ابى شيبة ١/٣٠٣)

'হযরত হাসান বসরী ও কাতাদাহ (রহ.) বলেন, মহিলা যখন সিজদা করবে তখন সে যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে। অঙ্গপ্রতঙ্গ ফাঁকা রেখে সিজদা করবে না, যাতে কোমর উঁচু হয়ে না থাকে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১/৩০৩)

পঞ্চম পার্থক্য : বৈঠকের ক্ষেত্রে মহিলাগণ উভয় পা বাঁ পাশ দিয়ে বের করে দিয়ে যমীনের ওপর নিতম্ব রেখে উরুর সাথে পেট মিলিয়ে রাখবে।

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اذا جلست المرأة فى الصلوة وضعت فخذها على فخذها الاخرى ,واذا سجدت الصقت بطنها فى فخذها كاستر ما يكون لها(البيهقى فى السنن الكبرى٢/٢٢٣)

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন উমর থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) বলেছেন, মহিলা যখন নামাযের মধ্যে বসবে তখন যেন এক উরু (ডান উরু) আরেক উরুর

'ইমাম তহাবী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মহিলারা তাদের উভয় হাতকে বুকের ওপর রেখে দেবে, আর এটাই তাদের জন্য যথোপযুক্ত সতর। (আসসিআয়া : ২/১৫৬, ফাতাওয়ায়ে শামী : ১/৫০৪, আল মাবসূত সারাখসী : ১/২৫)

তৃতীয় পার্থক্য : রুকুতে কম ঝোঁকা।

عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء : قال تجمع المرأة اذا ركعت ترفع يديها الى بطنه ,وتجمع ما استطاعت ,فاذا يديها اليها ,وتضم بطنها وصدرها الى فخذيها ,وتجتمع ما استطاعت(مصنف عبد الرزاق : ٦٨٥٠)

'যখন মহিলা রুকুতে যাবে তখন হাতদ্বয় পেটের দিকে উঠিয়ে যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে, আর যখন সিজদা করবে তখন হাতদ্বয় শরীরের সাথে এবং পেট ও সিনাকে রানের সাথে মিলিয়ে দেবে এবং যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে।

চতুর্থ পার্থক্য : সিজদা জড়সড় হয়ে করা।

عن يزيد بن ابى حبيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان ,فقال اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست فى ذالك كالرجل (كتاب المراسيل لابى داود برقم٨٠)

'বিখ্যাত তাবেঈ ইয়াযীদ ইবেন আবী হাবীব হলেন, একবার নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে (সংশোধনের উদ্দেশ্যে) বললেন, যখন সিজদা করবে তখন শরীর যমীনের সাথে মিশিয়ে দেবে। কেননা মহিলারা এ ক্ষেত্রে পুরুষদের মতো নয়।' (কিতাবুল মারাসীল ইমাম আবূদাউদ হা. নং ৮০)

আবূ দাউদ (রহ.)-এর উক্ত হাদীস

পথকে জনগণের মাঝে চালিয়ে দেওয়ার ও জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার কিছু নমুনা নিম্নে পেশ করা হলো :

আরবের প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী তার 'সিফাতুস সালাত' নামাক গ্রন্থে দাবি করেন যে, পুরুষ-মহিলার নামাযের পদ্ধতি এক ও অভিন্ন এবং তিনি তার এ দাবি হাদীসবিরোধী নয় এ কথা প্রমাণ করার জন্য প্রথম পর্যায়ে তিনি আহলে হকের পক্ষের মহিলাদের নামাযের পার্থক্য সম্বলিত মারাসীলে আবূ দাউদের হাদীসটিকে এ কথা বলে যয়ীফ আখ্যা দিলেন যে, 'হাদীসটি মুরসাল, অতএব তা যয়ীফ' অথচ অধিকাংশ ইমাম বিশেষ করে স্বর্ণযুগের ইমামদের মতে প্রয়োজনীয় শর্তাবলি বিদ্যমান থাকলে মুরসাল হাদীসও মারফূ এবং সহীহ হাদীসের মতো গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। বিশেষ করে আবূ দাউদ (রহ.)-এর এই হাদীসটির শুদ্ধতার পক্ষে সমস্ত ইমামগণ এমনটি গাইরে মুকাল্লিদ আলেম সিদ্দীক হাসান খান সাহেবও স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।

তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বীয় মনগড়া উক্তিকে প্রমাণের জন্য ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি নাকি বলেছেন, 'মহিলাগণ পুরুষদের মতোই নামায আদায় করবে' এই উক্তি উল্লেখ করে মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অথচ এই গ্রন্থের কোথাও এই কথাটি নেই। বরং 'মাকতাবায়ে শামেলার' হাজার হাজার কিতাব সার্চ করেও এই উক্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি। দ্বীনের নামে এমন জালিয়াতির কোনো অর্থ হয় না।

তৃতীয় কাজটি এই করলেন যে, উম্মে দারদা (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন যে, 'তিনি নামাযে পুরুষের মতো বসতেন' আলবানী সাহেব যদিও এই উক্তি দ্বারা নিজের দাবি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই উক্তি দ্বারা পুরুষ-মহিলার নামাযের পার্থক্যের কথাই প্রমাণিত হয়। কেননা উভয়ের বসার পদ্ধতি এক হয়ে থাকলে 'উম্মে দারদা পুরুষের মতো বসতেন' এ কথা বলার প্রয়োজন কী? যেহেতু উম্মে দারদা মহিলাদের নামাযে বাসার প্রচলিত ও সাধারণ নিয়মের উল্টো করে পুরুষদের মতো বসতেন, যা ছিল একটি ব্যতিক্রমী জিনিস। তাই এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ কথা বুখারী (রহ.)-এর 'তারীখে সগীরে' স্থান করে নিয়েছে।

এ ছাড়া আহলে হাদীস ভাইয়েরা নিজেদের উদ্ভাবিত আরো কিছু যুক্তি-তর্ক পেশ করে থাকেন, যেগুলোর দুর্বলতা দ্বীনের বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান রাখেন এমন যে কেউ বুঝতে সক্ষম। তাই সেসব বিষয়ের অবতারণা করা হলো না।

আহলে হাদীস ভাইগণ পুরুষ-মহিলাদের অনেক ইবাদতে পার্থক্য মানেন, যেগুলোর ভিত্তি মহিলাদের সতর ঢাকার ওপর। যেমন ইহরাম অবস্থায় পুরুষের জন্য মাথা ঢাকা নিষেধ অথচ মহিলাদের জন্য মাথা ঢেকে রাখা ফরয। অনুরূপভাবে পুরুষগণ উচ্চ আওয়াজে তালবিয়া পাঠ করে থাকেন অথচ মহিলাদের জন্য নিম্নস্বরে তালবিয়া পড়া জরুরি। এত শুধু হজ্বের কথা উল্লেখ করা হলো, এ ছাড়া আরো অনেক ইবাদতে পুরুষ-মহিলার পার্থক্য সবাই মেনে আসছে। তাহলে নামাযের ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলার পার্থক্য মানতে তাদের সমস্যা কোথায়? এই পার্থক্য তো আমাদের মনগড়া কোনো বিষয় নয়। সরাসরি হাদীস ও আসারে সাহাবা থেকে প্রমাণিত। আহলে হাদীস বন্ধুরা একদিকে হাদীস মানার দাবি করছে আবার অন্যদিকে হাদীসের উল্টা কাজ করছে, কী আজব বৈপরীত্য?

মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো যাদের লক্ষ্য এবং মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যাদের উদ্দেশ্য, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পুরুষদের জামা'আতে মহিলাদের অংশগ্রহণ! শরীয়ত কী বলে?

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বর্ণনায় মহিলাদের নামাযের উত্তম স্থান

ক. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, মহিলার জন্য নির্ধারিত হুজরায় নামায অপেক্ষা তার ঘরে নামায পড়া উত্তম, আর ঘরে নামায অপেক্ষা নিভৃত ও একান্ত কোঠায় নামায পড়া উত্তম। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৫৭০)

খ. একদা হযরত উম্মে হুমাইদ (রা.) রাসূল (সা.)-এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সঙ্গে নামায পড়তে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি জানি তুমি আমার সঙ্গে নামায পড়তে ভালোবাস, কিন্তু তোমার ঘরে নামায তোমার বাইরের হুজরায় নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার হুজরায় নামায তোমার বাড়িতে নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার বাড়িতে নামায তোমার মহল্লার মসজিদে নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার মহল্লার মসজিদে নামায আমার মসজিদে নামায অপেক্ষা উত্তম। অতঃপর উক্ত মহিলা

নিজ ঘরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নামাযের স্থান নির্ধারণ করিয়ে নিল এবং আমরণ তাতেই নামায আদায় করল। মুসনাদে আহমাদ, সহীহ ইবনে খুযাইমা ও সহীহ ইবনে হিব্বান, সূত্র "তারগীব-তারহীব" হাদীস নং ৫১৩

গ. হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, গৃহাভ্যন্তরই হলো মহিলাদের জন্য উত্তম মসজিদ। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৬৫৯৮)

উপর্যুক্ত সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় :

ক. মহিলাদের নামাযের জন্য তাদের নিজ গৃহকোণ মসজিদ অপেক্ষা উত্তম।

খ. রাসূল (সা.) নিজেই মহিলাদেরকে মসজিদে গমন থেকে নিরুৎসাহিত করেছেন।

গ. রাসূল (সা.) যে পন্থাকে উত্তম বলেছেন তার বিপরীতটা উত্তম ও সওয়াবের কাজ হতেই পারে না। কেউ এ ধরণের মনোভাব পোষণ করলে তা হবে চরম বেয়াদবী।

বি. দ্র. হাদীসের কয়েকটি বর্ণনা যা মহিলাদের মসজিদে আসা প্রসঙ্গে পাওয়া যায় তা প্রাথমিক যুগের কথা, তখন পুরুষরাও সকল মাসআলা জানত না, তখন কয়েকটি কঠিন শর্ত সহকারে রাতের আঁধারে নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে একদম পেছনের কাতারে দাঁড়ানোর অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু

পরবর্তীতে নবী (সা.) উক্ত অনুমতি প্রত্যাহার করে তাদেরকে ঘরে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সুতরাং ঐ সকল হাদীস দ্বারা বর্তমানে মহিলাদের মসজিদে গমন জায়েয বলা যাবে না।

মহিলাদের মসজিদে গমন প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহাবীদের উক্তি :

ক. সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারিণী ও উম্মতের শ্রেষ্ঠ মহিলা আলেম আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখতেন যে, মহিলারা (সাজসজ্জা গ্রহণে, সুগন্ধি ব্যবহারে ও সুন্দর পোশাক পরিধানে (মুসলিম শরীফের টিকা দ্রষ্টব্য) কী পন্থা উদ্ভাবন করেছে তাহলে অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন, যেমন নিষেধ করা হয়েছিল বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে। (সহীহ বুখারী হাদীস নং ৮৬৯, সহীহ মুসলিম শরীফ হাদীস নং ৪৪৫)

খ. হযরত আমর শাইবানী (রহ.) বলেন, আমি (এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকাহবিদ) সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে দেখেছি যে, তিনি জুমু'আর দিনে মহিলাদেরকে মসজিদ হতে বের করে দিতেন এবং বলতেন, তোমরা নিজ ঘরে চলে যাও, তোমাদের জন্য ইহাই উত্তম। (হাদীসটি ইমাম তাবারানী নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন। "তারগীব-তারহীব" হাদীস নং ৫২৩)

উল্লেখ্য, এ হলো নবীযুগের পরপরই মসজিদে গমনকারিণী মহিলাদের অবস্থার পরিবর্তনে হযরত আয়েশা (রা.)-এর উক্তি ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আমল। অথচ তখনকার মহিলারা ছিলেন সাহাবী অথবা তাবেঈ, অন্য কেউ নন। পক্ষান্তরে আজ চৌদ্দ শতাব্দী পরে যখন মহিলাদের তেল, সাবান, শ্যাম্পুসহ সকল প্রকার প্রসাধনীই সুগন্ধিযুক্ত। অধিকাংশ মহিলাই পর্দা করে না। যারা বোরকা পরে তাদের অধিকাংশই সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল চেহারাকে উন্মুক্ত রাখে এবং তাদের বোরকা ও পোশাক হয় নজরকাড়া ফ্যাশনের। এ অবস্থা রাসূল (সা.) দেখলে মহিলাদেরকে মসজিদে গমনের অনুমতি দিতেন, এটা বিবেকবান কেউ কি কল্পনা করতে পারে?

মহিলাদের মসজিদে গমনের ব্যাপারে হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের সিদ্ধান্ত :

ক. হানাফী মাযহাব : সকল মহিলার জন্য জামা'আত, জুমু'আ, ঈদ ও পুরুষদের মাহফিলে অংশগ্রহণ সর্বাবস্থায় মাকরূহে তাহরীমী। আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু: ১/১১৭২।

খ. মালেকী মাযহাব : অতি বৃদ্ধা মহিলা ছাড়া সকল মহিলার জন্য জুমু'আয় অংশগ্রহণ হারাম।

গ. শাফেঈ মাযহাব : অতি বৃদ্ধা মহিলা ছাড়া সকল মহিলার জন্য জুমু'আসহ যেকোনো জামা'আতে অংশগ্রহণ সর্বাবস্থায় মাকরূহে তাহরীমী। আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ: ১/৩১১, ৩১২।

প্রিয় পাঠক! উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা যা পেলাম এর বিপরীতে এমন কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীস ও ফিকহী বর্ণনা নেই, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো যুগে মহিলাদের মসজিদে গমন ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব কিংবা অধিক সওয়াবের কাজ ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীগণ ও পরবর্তী ফিকাহবিদ ইমামগণ মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে উৎসাহিত করেছেন। তাহলে বর্তমানে নৈতিক অবক্ষয়ের চরম মুহূর্তে কী করে তা সাওয়াব ও আগ্রহের কাজ হতে পারে? যে সকল আলেম বা স্কলার বর্তমানে মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে উৎসাহিত করেন, তাঁরা কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), হযরত আয়েশা ও ইবনে মাসউদ (রা.) এবং মুজতাহিদ ইমামগণের চেয়েও বেশি যোগ্য ও অনুসরণীয় হয়ে গেলেন? যে

সকল স্কলার অসংখ্য বেগানা মহিলাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ইসলামী লেকচার প্রদান করেন। কিংবা লক্ষ লক্ষ বেগানা মহিলাকে দেখার জন্য বিনা প্রয়োজনে নিজেকে উপস্থাপন করেন। অথচ সহীহ হাদীসের আলোকে এ সবই নিষিদ্ধ। (দেখুন : সুনানে তিরমিযী হাদীস নং ২৭৮২, সুনানে আবূ দাউদ হাদীস নং ৪১১২) বাস্তব দ্বীন ও ইসলামের ক্ষেত্রে এরাও কি গ্রহণযোগ্য হয়ে গেলেন ?

মাসআলা ক. একই নামাযে জামা'আতে নামায পড়ার ক্ষেত্রে যে সকল পুরুষের সম্মুখে কিংবা পাশে কোনো মহিলা থাকবে সে সকল পুরুষের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। ফাতাওয়ায়ে শামী : ১/৫৭৩ আলমগীরী : ১/৯৭)

এ কারণেই হারাম শরীফে পুরুষদের সম্মুখে ও পাশে দাঁড়ানো থেকে মহিলাদেরকে নিবৃত্ত করতে কর্তৃপক্ষ সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকে।

মাসআলা খ. মসজিদের যে তলায় মহিলারা জামা'আতে অংশগ্রহণ করে তার উপরতলায় বরাবর স্থানের পেছনে যে সকল পুরুষ দাঁড়াবে তাদের সকলের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। ফাতাওয়ায়ে শামীসহ দুররে মুখতার : ১/৫৮৪, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী : ১/৯৭)

উল্লেখ্য, টার্মিনাল, জংশন, এয়ারপোর্ট ও মুসাফিরদের যাত্রাবিরতির স্থানসমূহে, অনুরূপ হাসপাতাল ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় স্থানে মহিলাদের নামায আদায়ের ব্যবস্থা রাখা জরুরি। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট। হারামাইন শরীফাইন ও মক্কা-মদীনার পথে মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থা মূলত এ প্রেক্ষিতেই। যেন তাওয়াফ-সাঈর জন্য আগমনকারিণী, যিয়ারত ইত্যাদির জন্য বাইরে গমনকারিণীরা ও ভ্রমণরত মহিলারা সময় হলে নামায পড়ে নিতে পারে। এ সকল স্থানে স্থানীয় আরব মহিলাদেরকে সাধারণত দেখা যায় না, তারা নিজেদের ঘরেই পড়ে নেয়। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা হারামাইন শরীফাইনে আগান্তুক শরীয়তের হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ মহিলাদের জামা'আতে হাজির হওয়া দেখে এসে নিজেদের আবাসিক এলাকার মসজিদে মহিলাদের ব্যবস্থা রাখার দাবি তোলে। অথচ সকল বালেগ পুরুষদের জন্য যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতে শরীক হয়ে পড়া ওয়াজিব, এর জন্যও যে কিছু করণীয় আছে তা চিন্তাও করে না। বিষয়টি এক প্রকার গোমরাহী, যা গভীরভাবে ভাবা উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল প্রকার গোমরাহী থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৫

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

ছামানিয়্যাত কাকে বলে?

ছামানিয়্যাতের অর্থ হলো কোনো বস্তু পণ্যের বিনিময় মাধ্যম বা ছামান হিসেবে নির্ধারিত হওয়া।

ছামানের সংজ্ঞা :

الثمن اسم لما هو عوض من المبيع

অর্থাৎ যেকোনো বিক্রিত পণ্যের বিনিময় মাধ্যমকে ছামান বলা হয়। (আল মুগরাব ফিতারতীবিল মু'রাব)

قال الليث ثمن كل شئ قيمته

প্রতিটি বস্তু ও পণ্যের ছামান হলো তার বিনিময় মূল্য। (তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত)

والمعروف ان الثمن هو ماجعل عوضا فى عقد البيع

অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হলো ওই বস্তুকে ছামান বলা হয়, যাকে কেনাকাটার সময় বিনিময় নির্ধারণ করা হয়। (তাতাউরুন নুকূদ, পৃ. ১৩৩)

উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহের সারমর্ম হলো বাই (Sale) চুক্তিতে যেই বস্তু বিক্রেয় পণ্যের বিনিময় হয়, তাকে ছামান বলা হয়।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞা দ্বারা বোঝা যায়, ছামান (বিনিময় মাধ্যম) ও মুদ্রা শব্দদ্বয় সমার্থক নয়। বরং ছামান (বিনিময় মাধ্যম) শব্দটা মুদ্রা (Money) থেকে ব্যাপক অর্থবোধক। প্রতিটি মুদ্রা পণ্যের ছামান (বিনিময় মাধ্যম) হয় তবে প্রত্যেক ছামান (বিনিময় মাধ্যম) বা মুদ্রা (Money) হওয়া জরুরি নয়।

তাই যে সমস্ত উলামায়ে কেরামের নিকট Mony তথা মুদ্রার মধ্যে রিবা (সুদ)-এর ইল্লাত (Cause) সাধারণ মূল্যমান হওয়া তাদের সে বক্তব্যের ব্যাখ্যা দাঁড়াবে মুদ্রা হয় তো ছামানে খিলকী অর্থাৎ প্রকৃতিগত বিনিময় মাধ্যম অথবা তা প্রচলিত ছামান হবে। অর্থাৎ যাকে মানুষ লেনদেনের ক্ষেত্রে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করে। যথা পয়সা, ব্যাংক নোট ইত্যাদি।

এ পর্যায়ে মুদ্রা (Money) ছামান (বিনিময় মাধ্যম) সমার্থক শব্দ হতে পারে।

ছামান (বিনিময় মাধ্যম) তিন প্রকার :

১। ছামানে খিলকী তথা প্রকৃতিগত 'বিনিময় মাধ্যম' যথা স্বর্ণ-রৌপ্য। ২। ছামানে ইসতিলাহী, পারিভাষিক 'বিনিময় মাধ্যম'–যথা পয়সা ও ব্যাংক নোট। ৩। ছামানে ইত্তিফাকী সম্মতিমূলক 'বিনিময় মাধ্যম' যথা কোনো বস্তুকে পারস্পরিক সম্মতিতে পণ্যের বিনিময় মাধ্যম বানিয়ে নেয়া।

নোট Note কাকে বলে?

১৭০০ ইংরেজিতে ব্যাংকার ও স্বর্ণকারদের পক্ষ থেকে ইস্যুকৃত রসিদ উন্নতি লাভ করে রীতিমতো নোটের আকৃতি ধারণ করে। এবং পর্যায়ক্রমে নোট ব্যাংক নোটে (Bank Note) পরিণত হয়। যার পরবর্তী রূপ (Legal Tender) আইনত গ্রাহ্য মুদ্রা।

নোট সরকারের এক প্রকার চুক্তিপত্র, যা সরকারি মোহরযুক্ত মুদ্রার মতো বাধ্যতামূলক গ্রহণীয় বানানো হয়েছে। (জাদীদ ফিকহী মাবাহেছ ২/৮৮)

আল্লামা সায়্যিদ আহমদবেগ আল হোসাইনী তার রচিত গ্রন্থ 'বাহজাতুল মোশতাক' কিতাবে নোট বিষয়ে লেখেন যে, আমরা যখন ব্যাংক নোট (Bank Note) বিষয়ে গবেষণা করি তখন আমরা দেখতে পায় যে এই শব্দটা ফ্রান্সের একটি পরিভাষা এবং ফরাসি ভাষার প্রসিদ্ধ অভিধান 'লারে সে' ব্যাংক নোটের সংজ্ঞায় লেখেন, ব্যাংক নোট একটা কারেন্সি নোট, যার বাহককে চাহিবামাত্র ওই নোটের বাস্তব মূল্য দিয়ে দেওয়া হবে। এবং এই নোট এভাবেই প্রচলিত হয়। তবে এই নোটের বিনিময়ের জামানত দেওয়া যায়, যাতে সর্বসাধারণ এর লেনদেনের ওপর আস্থাশীল হয়।

উল্লেখ্য, নোট, ব্যাংক নোট এবং (Paper Money) একই জিনিস, যাকে আরবীতে الاوراق النقدية বা النقود الورقية বা الانواط বলা হয়।

নোটগুলোর ফিকহী ও শরয়ী অবস্থান :

কারেন্সি নোটের ফিকহী মর্যাদা ও অবস্থান বিষয়ে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পায়। তবে উল্লেখযোগ্য ও প্রসিদ্ধ মত হলো চারটি-

১। নোট ঋণের সনদ (Debt Certificate)

২। নোট পণ্য (Goods)

৩। নোট স্বর্ণ রুপার বিকল্প (Substitute)

৪। নোট নিজেই ছমনে উরফী প্রথাগত 'বিনিময় মাধ্যম' এবং পয়সার মতো।

উপরিউক্ত মতামতগুলোর ব্যাখ্যা :

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা :

বিগত শতাব্দীর ভারতবর্ষের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম যথা ফক্বীহুল উম্মাত আল্লামা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.), হাকিমুল উম্মাত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.), মুফতিয়ে আজম পাকিস্তান আল্লামা মুফতী শফী দেওবন্দী (রহ.)-এর মত ছিল যে, নোট হলো ঋণের সনদ। নোট মালও নয়, স্বর্ণ ও রুপার বিকল্পও নয় এবং স্বয়ং ছামানে উরফী বা প্রথাগত 'বিনিময় মাধ্যম'ও নয় বরং নোট হলো ওই ঋণের একটি সার্টিফিকেট, যা নোট বাহকের জন্য নোট ইস্যুকারীর দায়িত্বে ওয়াজিব।

উপর্যুক্ত মতের স্বপক্ষে দলিলসমূহ :

১। প্রতিটি নোটের ওপর এই অঙ্গীকার লেখা থাকে যে বাহককে চাহিবামাত্র উক্ত নোটের বাস্তব মূল্য আদায় করা হবে। সুতরাং উক্ত অঙ্গীকার এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, নোট হলো ঋণের সার্টিফিকেট। যেমনটা আল্লামা সৈয়দ আহমদবেগ আল হোসাইনী (রহ.) নোটের বাস্তবতা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন

قابلة لدفع قيمتها لدى الاطلاع لحاملها لم يجعل شكا فى انها سندات ديون

অর্থাৎ, নোটের বাহককে তার চাহিবামাত্র নোটের বাস্তব মূল্য আদায় করে দেওয়া হবে। এই কথাটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে নোট হলো ঋণের সার্টিফিকেট। (বুলুগুল আমানী আলাল ফাতহির রব্বানী ২/২৪৮)

২। এই নোটগুলোর বিকল্প মূল্য স্বর্ণ অথবা রুপার আকৃতিতে নোট ইস্যুকারীর স্টকে থাকা আবশ্যক, যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই নোটগুলোর মূল্য তার বিপরীতে মজুদ বস্তুর মূল্যের কারণে। সুতরাং নোট হলো তার বিপরীতে মজুদ বস্তুর সার্টিফিকেট। (ফাতাওয়া সা'দিয়া পৃ. ৩২৪)

৩। নোট হলো কাগজের একটা সাধারণ টুকরা বা অংশ। তন্মধ্যে কিছু বেশি মূল্যমানের আবার কিছু কম মূল্যমানের যথা ১০০ টাকার নোট ও ৫০ টাকার নোট অথচ উভয়টা কাগজের টুকরা কিন্তু মূল্যমানের মধ্যে ব্যবধান এটাই প্রমাণ করে যে মূল বস্তু হলো নোটের বিপরীতে মজুদ বস্তুটিই।

৪। যদি ওই নোটগুলো দ্বারা মানুষের লেনদেন Custom শেষ হয়ে যায় তখন সরকার ওই নোটগুলোর জরিমানা আদায় করে। এটাও স্পষ্ট প্রমাণ যে নোট ঋণের সার্টিফিকেট।

উপরোক্ত মতের ভিত্তিতে আনুষঙ্গিক কিছু ফিকহী জটিলতা :

১. বায়-ছালামের মধ্যে নোট Capital হতে পারে না, কেননা নোটের ওপর কব্জ করা ছামানের ওপর কব্জ নয়। বরং তার সনদের ওপর কব্জ। তাই Capital এর ওপর কব্জ পাওয়া যায়নি। অথচ বায়-ছালামের মধ্যে Capital এর ওপর কব্জ জরুরি। নচেৎ 'বাই উল কালী বিল কালী' তথা ঋণের বেচাকেনা ঋণের সাথে হবে, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

২. নোট দ্বারা স্বর্ণ-রুপার বেচাকেনা বৈধ হবে না। কেননা এটা 'বাই ছরফ' বা মুদ্রা ব্যবসা হবে, এই ধরনের বেচাকেনায় উভয় বিনিময়ের ওপর ওই বৈঠকেই কব্জ করা জরুরি। অথচ এ ক্ষেত্রে নোটের ওপর কব্জ বাস্তবে স্বর্ণ-রুপার রসিদের ওপর কব্জ। অন্যদিকে স্বর্ণ বা রুপা বাকি বিধায় বিনিময় দ্বয়ের ওপর কব্জ পাওয়া যায়নি। (আহকামুল আওরাকিননাকদিয়্যা, পৃ. ১৭৬)

৩. নোট প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে না, যতক্ষণ না যাকাত গ্রহীতা এর দ্বারা কোনো কিছু ক্রয় না করবে (এমদাদুল ফাতাওয়া ২/৫)

৪. নোট দ্বারা লেনদেন হল হাওয়ালা (বদলি-Transfer)

উদাহরণ, রহিম করিমকে, একটা নোট দিয়ে তার কাছ থেকে একটা পণ্য কিনল, এর অর্থ হলো রহিম করিমকে নোটটা প্রদান করে এটাই বলল যে, অমুকের কাছে আমার যে পাওনা আছে এ নোটটা তার রসিদ বা সার্টিফিকেট। তুমি আমার পরিবর্তে নোট ইস্যুকারীর কাছ থেকে এই রসিদের মাধ্যমে তোমার প্রাপ্য উসুল কর। এটাই হলো হাওয়ালা বা Transfer।

৫. নোটের বিনিময় নোট দ্বারা বৈধ হবে না, যদিও উভয়টা ভিন্ন জাতীয় হয়, কেননা এটা হবে ''বাইউল কালী বিল কালী'' তথা-ঋণের বেচাকেনা ঋণ দ্বারা, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।

পর্যালোচনা :

উপর্যুক্ত মত দ্বারা শরীয়া বিধান ও বিভিন্ন Transactions এ যেসব সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তা পরিষ্কার। কেননা নোট দ্বারা উপরোল্লিখিত লেনদেন বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ শরীয়তে কুরআন ও সুন্নাহর নছ Provision দ্বারা জটিলতা নিরসন করা হয়েছে যথা আল্লামা আব্দুর রহমান আসসা'দী তিনি তার ফাতাওয়াতে লেখেন-

لايخفى ان جميع اقطار الدنيا الا لنزر اليسير كل معاملاتهم فى هذه الاوراق التى تسمى الانواط فلو حكم لها باحكام السندات والديون لتعطلت المعاملات فى الوقت الذى تقتضى الاحوال وظروفها ان يخفف فيه غاية التخفيف

অর্থাৎ সারা বিশ্বের লেনদেন ওই সব নোট দ্বারাই সম্পাদিত হচ্ছে। সুতরাং যদি এই নোটগুলোকে ঋণের রসিদ বা সার্টিফিকেট বলা হয়, তাহলে সব লেনদেন বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ সময়ের চাহিদা হলো লেনদেনের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শৈথিল্য অবলম্বন করা। (ফাতাওয়া সাদিয়া, পৃ. ১৮২)

বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ জাস্টিস তৃকী উসমানী বলেন,

فيه حرج عظيم والمعهود من الشريعة السمحة فى مثله السعة والسهولة۔

উক্ত মত অনুসরণে ভীষণ ও অসম্ভব অসুবিধা ও সংকীর্ণতা রয়েছে অথচ ইসলামী শরীয়তের চাহিদাই হলো এ ধরনের অবস্থায় সংকীর্ণতা পরিহার করা। (আহকামুল আওরাকিন নাকদিয়্যা, পৃ. ১৬)

এবং এ ধরনের সংকীর্ণতাকে জনসাধারণ গ্রহণ তো করবেই না বরং হারাম লেনদেনে জড়িয়ে পড়বে। পাশাপাশি নোট ঋণের সার্টিফিকেট হওয়া কোনো স্পষ্ট সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিতও নয়। তাই উত্তম হলো,

নোটকে (Debt Certificate) না বলা যাতে মানুষ হারামের লেনদেন থেকে পরিত্রাণ পায়।

কারেন্সি নোটের ওপর যেই অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ থাকে যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে, তা প্রাথমিক যুগে যদিও যথার্থ ছিল কিন্তু বর্তমানে তা নিরর্থক। কেননা বর্তমানে নোট ইস্যুকারী নোটের বাহক (Holder)-কে স্বর্ণ বা রৌপ্য প্রদানের দায়ভার গ্রহণ করে না। বরং কাগজের নোটের বিপরীতে কোনো ধরনের স্বর্ণ বা রুপা থাকেই না বর্তমানে। নোটের ওপর লিখিত অঙ্গীকার দ্বারা উল্লেখযোগ্য লাভ এতটুকু যে ইস্যুকারী বাহককে অন্য নোট দিয়ে দিতে পারে অথবা অন্য কোনো পণ্য পরিশোধ করতে পারে। যেমনটা (Geoffry Growther) লেখেন কারেন্সি নোটের ওপর যা লেখা তাকে যে বাহককে চাহিবামাত্র দিতে বাধ্য থাকিবে। বর্তমানে এর কোনো অর্থ বা লক্ষ্য নেই। তাই বর্তমান যুগে কারেন্সি নোটের কোনো একটাকে স্বর্ণে রূপান্তরের কোনো সুযোগ নেই। ওই নোটগুলোর পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন, বর্তমানে এই কাগজের নোটগুলো কেবলমাত্র কাগজের টুকরা বিশেষ, যার বাস্তব কোনো মূল্য নেই। কোনো ব্যক্তি যদি ব্রিটেনের পাউন্ড Bank of England-এ হস্তান্তর করে তাহলে ব্যাংক তাকে একটা Token Money দেবে অথবা এর পরিবর্তে অন্য কোনো মুদ্রা দেবে। কিন্তু কাগজের তৈরি পাউন্ড ব্রিটেনের সর্বত্র যর বা মুদ্রার মতো প্রচলিত।

সারকথা, এই অঙ্গীকার (Money Promese) নোটের মূল্যমানকে বাতিল করে না বরং আরো শক্তিশালী করে, কেননা এর দ্বারা নোটের মাধ্যমে লেনদেনের ওপর জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এই মত নেহায়েত দুর্বল এবং সংকীর্ণ বরং অকার্যকর। তাই বর্তমানে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

নোটসংক্রান্ত ফিকহবিদদের দ্বিতীয়মতের ব্যাখ্যা :

নোট হলো মাল ও পণ্য (Goods)। কেননা লেনদেনও সর্বপ্রকারের কার্যক্রম কাগজের নোটকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। আর কাগজ হলো মূল্যবান মাল, যার মূল্য ও মর্যাদা প্রথা ও প্রচলনের কারণে বেড়ে গেছে যথা–হীরা-মুক্তা অত্যন্ত মূল্যবান হয়, তবে ওইগুলোর মূল্যায়ন মাল এবং পণ্য হিসেবে হয়।

উপমহাদেশের উলামায়ে কেরামদের মধ্যে রামপুরের ওলামায়ে কেরাম এবং আহমদ রেজা খান বেরলভীর মত এটা। এবং এ মতটা শায়খ আব্দুর রহমান বিন সা'দীর নিকট গ্রহণযোগ্য মত। (ফাতাওয়া সা'দিয়া, পৃ. ৩২৭-৩২৯)

আহমদ রেজা খান বেরলভী তার রচিত গ্রন্থ كفل الفقيه الفاهم فى احكام القرطاس والدراهم এ লিখেন যে নোট হলো মাল ও পণ্য।

ঋণের সার্টিফিকেটও নয়। স্বয়ং ছমনও নয়। যথা-

اما اصله فمعلوم انه قطعة كاغذ والكاغذ مال متقوم ومازادته هذه السكة الا رغبة للناس اليه وزيادة فى صلوح ادخاره للحاجات وهذا معنى المال اى ما يميل اليه الطبع ويمكن ادخاره للحاجة

অর্থাৎ, নোটের আসল তো সবার জানা যে নোট একটা কাগজের টুকরা এবং কাগজ হলো মূল্যবান মাল এবং তা মুদ্রায় রূপান্তরিত হওয়াই এর প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেড়ে গেছে। এবং প্রয়োজনের স্বার্থে সঞ্চয় করে রাখার অধিকযোগ্য, যা মালেরই অর্থ অর্থাৎ মাল বলা হয় মানুষের স্বভাব, যার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য তাকে স্টক করে রাখা যায়।

উপর্যুক্ত মতের দলিলসমূহ :

১. পণ্যের Goods যত সব সংজ্ঞা রয়েছে সবটি কাগজের নোটের ওপর প্রযোজ্য হয়। যথা–

العرض هو كل ماعدا العين والطعام من الاشياء كلها☆

অর্থাৎ স্বর্ণ-রুপা এবং খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত সব কিছু পণ্যের অন্তর্ভুক্ত।

☆هو ماسوى النقد ক্যাশ (স্বর্ণ-রুপা) ব্যতীত সব কিছু পণ্য।

☆هو كل مالا زكوة فى عينه পণ্য বলা হয় ওই সব কিছুকে যার সত্তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না।

☆هو ماعدا الحيوان والطعام والنقد জীব-জন্তু, খাদ্যদ্রব্য এবং স্বর্ণ-রুপা ব্যতীত সব কিছু হলো পণ্য।

২. যখন নোটের বিনিময়ে কোনো বস্তু খরিদ করা হয় তখন ক্রয় চুক্তিটা ওই নোটের ওপরই মনে করা হয়, স্বর্ণ বা রুপার ওপর মনে করা হয় না এবং ওই নোটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়, যাতে মানুষ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই নোট নিজ সত্তার মূল্যায়নে স্বর্ণ ও রুপার সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা কেবলমাত্র কাগজের টুকরা। যদিও ছমন হওয়ার মধ্যে স্বর্ণ এবং রুপার মতো। কিন্তু স্বর্ণ বা রুপার মতো বিধায় তাকে স্বর্ণের বা রুপার হুকুম দেওয়া যাবে না। উদাহরণস্বরূপ হীরা-মুক্তা যদি মূল্যমানের মধ্যে স্বর্ণ বা রুপার সমান বা বেশি হয় তখন যেমনিভাবে হীরা মুক্তাকে স্বর্ণ বা রুপার হুকুম দেওয়া যায় না, তদ্রূপ নোটও তাই

৩. নোট পরিমাপ বা ওজনকৃত পণ্যও নয় এবং তার কোনো সমজাতও নয়, যার ওপর নোটকে তুলনা করা যেতে পারে।

৪. ইসলামী ফিকহবিদগণ এই মূলনীতি উল্লেখ করেছেন যে, নতুন সৃষ্ট কোনো ঘটনাকে তার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ নির্দিষ্ট রায় দেওয়া হয়েছে এমন বস্তুর ওপর তুলনা করা হবে। এবং এর হুকুম নতুন সৃষ্ট ঘটনার ওপর আরোপ করা হবে। উক্ত নীতির চাহিদা হলো নোটকে পণ্যের সাথে মেলানো। কেননা পণ্য বলা হয় ওই বস্তুকে, যা পরিমাপ ও ওজনকৃত ও হবে না। জীব-জন্তুও হবে

না এবং ভূমিও না।

৫. ওই নোটগুলোর কার্যকারিতা যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে তার কোনো মূল্যই থাকে না। এটাই প্রমাণ হলো যে নোট স্বয়ং কোনো মুদ্রা নয়, যদিও সাময়িকভাবে নোটকে Money সাব্যস্ত করা হয়েছে। যাতে মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে স্বর্ণ-রুপা ওগুলো সর্বাবস্থায় মুদ্রা। সুতরাং স্বর্ণ-রুপার ওপর নোটকে তুলনা করা এবং স্বর্ণ-রুপার বিধান নোটের ওপর প্রয়োগ করা সংগতিহীন তুলনা।

উপরোক্ত মতের ভিত্তিতে আনুষঙ্গিক কিছু ফিকহী জটিলতা :

উপর্যুক্ত মতানুসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর যে মাসআলা সংযুক্ত হয় তা হলো, কারেন্সি নোট সুদ সম্বন্ধীয় মাল নয়, তাই নোটের মধ্যে রিবাল ফজল (বিনিময়সংক্রান্ত সুদ) জায়েয হবে। তবে রিবাননাসীআ (বিলম্বজনিত সুদ) তাদের মতেও জায়েয হবে না, কেননা তা كل قرض جر نفعا فهو ربا এর সার্বিকতার অন্তর্ভুক্ত। যেমনটা আহমদ রেজা খান বেরলভী এক প্রশ্নের উত্তরে লেখেন-

نعم يجوز بيعه بأزيد من رقمه وبانقص منه كيفما تراضيا

হ্যাঁ, নোটের ওপর যা মূল্য লিখিত থাকবে তার থেকে কম বা বেশি দিয়ে নোট বিক্রি করা জায়েয হবে উভয়ের সম্মতিক্রমে। (কিফলুল ফকীহিল ফাহিম, পৃ. ৬২)

ফাতাওয়া ছা'দিয়াতে উল্লেখ আছে,

فتعين انها سلع يثبت لها مايثبت لسائر السلع من زيادة ونقصان وجواز بيع بعضها ببعض متماثلا او متفاضلا من جنس او اجناس

এটাই প্রমাণ হলো যে, নোট পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য পণ্যের মতো নোটের মধ্যেও কমবেশি করা জায়েয হবে। উভয় নোট সমজাতীয় হলেও না হলেও।

শায়খ সোলাইমান আল হামদান এক ফাতাওয়ায় লেখেন–

اذاعلم هذا فلا مانع من بيع الورق على اختلاف انواعه ومسمياته من الريالات او الدنانير او الجنيهات باحدالنقدين الذهب والفضة متفاضلا او نساء ولا دخل للربا فى شئ من ذلك لان الورق ليس من الاموال الربوية ولان الربا مختص بالمكيلات والموزونات والورق ليس بمكيل ولا موزون

সারমর্ম হলো, নোটের বিনিময়ের মধ্যে সুদের কোনো দখল নেই। কেননা নোট সুদ সম্বন্ধীয় মাল নয়। এবং সুদ ওই সব পণ্যের সাথে নির্দিষ্ট, যা পরিমাপ ও ওজনকৃত হয়, অথচ নোট এর অন্তর্ভুক্ত নয়। (জরীদাতুল বিলকীমস সাউদিয়া সংখ্যা ২৯১৭)

২। নোটের মধ্যে যদি ব্যবসার নিয়ত না থাকে তাহলে এর ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। (আল মু'আমালাতুল মালিয়া আল মু'আসারা)

৩। নোট দ্বারা মুদারাবা জায়েয হবে না। কেননা মুদারাবার মধ্যে মাল দিরহাম বা দিনার হওয়া জরুরি। অথবা নুকুদ (স্বর্ণ-রুপা) হওয়া জরুরি। অথচ নোট 'নুকুদ' না বরং 'উরুজ' পণ্য।

উপর্যুক্ত বিষয়াদির আলোকে উক্ত মতের ওপর পর্যালোচনা :

প্রথমত : উক্ত মতানুসারে নোটগুলোর মধ্যে রিবাল ফজল বা (বিনিময়সংক্রান্ত সুদ) ও রিবাননাসীয়া বা (বিলম্বজনিত সুদ) কোনোটায় পাওয়া যাবে না অথচ এটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটা কথা। কেননা এর দ্বারা সুদের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত : তাদের উত্থাপিত দলিলসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় দলিল ছিল নোটের ওপর উরুজ তথা পণ্য দ্রব্যের সংজ্ঞা প্রযোজ্য। অথচ তা সঠিক নয়। কেননা উরুজ তথা পণ্য দ্রব্যের উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো ইসলামী ফিকহবিদগণ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, যা সাধারণ কোনো সংজ্ঞা নয়।

উদাহরণস্বরূপ, যাকাত অধ্যায়ে জীব-জন্তুর যাকাত, ভূমির যাকাত, স্বর্ণ-রুপার যাকাতের বিধান উল্লেখ করেছেন। এর ধারাবাহিকতায় পণ্যের যাকাতের পালা যখন আসে, তখন ওই হিসেবে পণ্যের সংজ্ঞাও উল্লেখ করেছেন। যেমনটা মালেকী মাযহাবের কিতাব আল খারশীতে উল্লেখ আছে

المراد بالعرض هنا مقابل الذهب والفضة

পণ্য দ্রব্য বলতে এখানে ওই বস্তুকে বোঝানো হয়েছে, যা স্বর্ণ বা রুপা নয়। (আল খারশী ২/২৯৫)

উল্লেখিত বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ হয় যে পণ্যের উক্ত সংজ্ঞা সাধারণ সংজ্ঞা নয় বরং বিশেষ ক্ষেত্রে।

তৃতীয়ত : দলিল উল্লেখ করার ক্ষেত্রে এ কথা বলা যে, যখনই নোটের কার্যকারিতা শেষ হয়ে যাবে তার মূল্যও শেষ হয়ে যাবে। এটা নোটের মূল্যমান বিলোপ হওয়ার দলিল। নোটের মূল্যমান বিলুপ্ত হয়ে যাবে বা Value থাকবে না তখন তার ফিকহী অবস্থান ও মর্যাদা নিয়ে আলোচনাও হতে পারে না। আলোচনা তো কেবল ওই সময়, যখন নোটের মূল্যমান বা (Value) থাকবে। উপরোক্ত মতটি দু-একজন গবেষকের। কোনো ফকীহের মত নয়। যেহেতু এই মত গ্রহণের দ্বারা সুদের মতো অভিশপ্ত হারামের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায় বিধায় উম্মতের সর্বস্তরের ফকীহগণ তা গ্রহণ করেননি।

নোটের শরয়ী অবস্থান ও মর্যাদাসংক্রান্ত তৃতীয় মত :

নোট, সোনা-রুপার বিকল্প ও স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ নোটের মর্যাদা শুধু সার্টিফিকেটেরও নয়। পণ্যও নয় আবার স্বয়ংক্রিয় ছামানও নয়। কিন্তু প্রথা ও প্রচলনের কারণে যেহেতু ব্যাংক নোট আসল ছামান তথা সোনা-রুপার স্থলাভিষিক্ত এবং (Substitute) তাই আসলের বিধান বিকল্পের ক্ষেত্রেও

প্রযোজ্য হবে।

এ বিষয়ে আল্লামা আব্দুল হায় লখনভী (রহ.) লেখেন পয়সা যদিও প্রথাগত ছামান কিন্তু তাকে প্রকৃতিগত ছামান মনে করা হয় না। পক্ষান্তরে ব্যাংক নোট হুবহু প্রকৃতিগত ছামান। যদিও নোট প্রকৃতিগত ছামান নয়, প্রথাগত ছামান। তাই পয়সাকে পয়সার সাথে বিনিময়ের সময় অতিরিক্ত দেওয়া-নেওয়া বৈধ হলেও নোটকে নোটের সাথে বিনিময়ের সময় অতিরিক্ত দেওয়া-নেওয়া বৈধ হবে না। কেননা পয়সা ছামানের সমজাতীয় বস্তু নয় প্রকৃতিগতভাবেও প্রথাগতভাবেও। যদিও পরিভাষার কারণে পয়সার মধ্যেও ছামানিয়্যাত তথা মূল্যমান সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু ব্যাংক নোটকে প্রথাগতভাবে সব বিধিবিধানের ক্ষেত্রে হুবহু প্রকৃতিগত ছামান মনে করা হয়েছে তাই এতে অতিরিক্ত দেওয়া ও নেওয়া হারাম হবে। (মজমুআতুল ফাতাওয়া লখনভী ২/১৩৭)

শায়খ আহমদ আলবান্না নোট সম্পর্কে লেখেন-

فالذى اراه حقا وادين الله عليه ان حكم الورق المالى كحكم النقدين تماما سواء بسواء لانه يتعامل به كالنقدين تماما ولان مالكه يمكنه صرفه فى قضاء مصالحه به فى اى وقت شاء فمن ملك النصاب من الورق المالى ومكث عنده حولا كاملا وجبت عليه زكاة باعتبار الفضة

সারমর্ম, আমি যা সত্য মনে করতেছি তা হলো, ব্যাংক নোট সম্পূর্ণরূপে সোনা-রুপার হুকুমে, কেননা নোট দ্বারা সোনা-রুপার মতো লেনদেন হয়। এবং নোটের মালিকের পক্ষে সদাসর্বদা নিজের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। সুতরাং যে ব্যক্তি নোটের মধ্য থেকে নেছাব সমপরিমাণ নোটের মালিক হবে এবং এর ওপর একটি বছর অতিবাহিত হবে, ওই ধরনের ব্যক্তির ওপর রুপার হিসাবে যাকাত ওয়াজিব হবে। (আল ফতহুর রব্বানী)

এ সম্পর্কে ইসলামী ফিকহ একাডেমী জিদ্দার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

وبعدالاطلاع على قرار المجمع رقم ٩ فى الدورة الثالث بان العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة ثمنية كاملة ولها الاحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث احكام الربا والزكاة والسلم وسائر احكامها-

সারমর্ম, পেপার কারেন্সি নামমাত্র মুদ্রা। যাতে পরিপূর্ণ ছামানিয়্যাত বিদ্যমান। সুদ, যাকাত, ছলম এবং অন্যান্য যেসব বিধান সোনা-রুপার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ওই বিধানগুলো হুবহু ব্যাংক নোটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

তাদের দলিল :

১। ব্যাংক নোট সর্বপ্রকার লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বর্ণ-রুপার স্থলাভিষিক্ত হওয়াটা সবার নিকট স্বীকৃত তাই অনিবার্যভাবে বিধানের ক্ষেত্রেও ব্যাংক নোট স্বর্ণ-রুপার মতো হবে। বিশেষত উসুলের একটা নীতির আলোকে البدل له حكم المبدل অর্থাৎ বিধানের মধ্যে বিকল্পটা বদলকৃতের মতো হবে। এখানে বদলকৃত হলো স্বর্ণ-রুপা, বিকল্প হলো ব্যাংক নোট।

২। শরয়ী বিধানাবলির মধ্যে বিবেচ্য হলো অর্থ এবং উদ্দেশ্যের শব্দের নয়। যথা প্রসিদ্ধ উসুল হলো- الامور بمقاصدها অর্থাৎ সব বিষয়ের ভিত্তি উদ্দেশ্যের ওপর শব্দ, বাহ্যিকতার ওপরে নয়। নোট প্রণয়নের উদ্দেশ্যই হলো ছামানিয়্যাত তাই উদ্দেশ্য বিবেচনায় নোট স্বর্ণ-রুপার মতো হবে।

উপর্যুক্ত মতের ভিত্তিতে আনুষঙ্গিক কিছু ফিকহী মাসায়েল :

শরীয়তের সব বিধানের ক্ষেত্রে নোট যেহেতু স্বর্ণ-রুপার মতো হয়ে গেছে এবং স্বর্ণ-রুপার স্থান অধিকার করে নিয়েছে ব্যাংক নোট। সুতরাং ব্যাংক নোটের ওই সব বিধান হবে, যা স্বর্ণ-রুপার। যথা-

১. নোটের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

২. নোট দ্বারা যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

৩. নোটের মধ্যে সুদের সব প্রকারের বিধান চালু হবে। অর্থাৎ রিবাল ফজল তথা বিনিময়সংক্রান্ত সুদ, রিবাল নাসীয়্যা বিলম্বজনিত সুদ, নোটের মধ্যে হারাম হবে, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনায় এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে, দুইটা নোটের বিনিময় অতিরিক্তসহ ওই সময় নাজায়েয হবে যখন ওই নোটদ্বয় সমজাতীয় হবে। যদি নোটদ্বয় সমজাতীয় না হয় তখন আধিক্যের সাথে লেনদেন বৈধ হবে। তবে ওই সময়ও উভয়টার ওপর ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কব্জ ওই বৈঠকেই জরুরি হবে। কেননা এটা বাই ছরফ বা মুদ্রা বিনিময়। যাতে উভয় বিনিময়ের ওপর তাৎক্ষণিক কব্জ জরুরি।

৪. নোটের মধ্যে শর্তসহকারে বাইছরফ জায়েয :

পর্যালোচনা :

লেনদেনের মধ্যে নোট স্বর্ণ-রুপার মতো প্রচলন পাওয়া এ কথা প্রমাণ করে না যে নোটের মূল স্বর্ণ-রুপা এবং নোট তার প্রতিনিধিত্বকারী এবং উভয়টার বিধান এক ও অভিন্ন। অথচ এতে এ ধরনেরও সম্ভাবনা আছে যে, নোট স্বয়ং সম্পূর্ণ ছামান যেমনটা পয়সা। সুতরাং উল্লেখিত দাবিটি নেহায়েত দুর্বল।

যেহেতু ব্যাংক নোটের বিপরীতে মূলত কোনো ধরনের স্বর্ণ বা রুপার উপস্থিতি নেই সুতরাং যাকাত বা সুদের মাসআলায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনেক মুশকিল, নোটের মূল হলো স্বর্ণ, নোট তার বিকল্প বা নোটের মূল হলো রুপা, নোট তার বিকল্প। তদুপরি এই সিদ্ধান্তের দ্বারা জনসাধারণ বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবে। অথচ সমস্যা সৃষ্টি করা ইসলামী শরীয়তের স্বভাববিরোধী-সর্ব প্রকারের সমস্যার নিরসনই হলো ইসলামী শরীয়তের অন্যমত মূলনীতি।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

শবে বরাত নিয়ে বাড়াবাড়ি কেন

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু। অসীম মেহেরবান। তিনি উদার ক্ষমাশীল। ক্ষমা তাঁর অন্যতম আদর্শ, শ্রেষ্ঠ গুণ। ক্ষমা করার জন্য ক্ষমা প্রার্থীর আবেদনের অপেক্ষায় থাকেন তিনি। বাতলে দিয়েছেন এর অসংখ্য পথ ও পাথেয়। মহা ক্ষমার ঘোষণা করেছেন তিনি কুরআন-হাদীসের স্থানে স্থানে। স্বীয় বান্দাদেরকে প্রদান করেছেন তিনি ক্ষমার সুবর্ণ সুযোগ আর বিশাল বিশাল অফার। বরাদ্দ করেছেন ক্ষমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সময়। যে সময়ে তিনি মহাপাপীদের মুক্তি দেন, স্তর তরান্বিত করেন, মর্যাদা বাড়িয়ে দেন, বাড়িয়ে দেন ভালো কাজের বিনিময় অনেক অনেক গুণে। মুছে দেন পাপীদের কালিমার সব চিহ্ন। এই মহা অফারসমূহের অন্যতম একটি হলো শবে বরাত।

শবে বরাত পরিচিতি

আরবী বছরের অষ্টম মাস শাবান। এই শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে ফার্সি ভাষায় শবে বরাত বলে। শব অর্থ রাত এবং বরাত অর্থ মুক্তি। এক কথায় 'শবে বরাত' মানে মুক্তির রজনী। এই রাতে পরমকরুণাময় মুক্তি ও মাগফিরাতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। তাই এর নাম 'মুক্তির রজনী' বা 'শবে বরাত'।

বিজ্ঞজনদের গবেষণা মতে কুরআনে কারীমে এই রাতকে ليلة مباركة (ভাগ্য রজনী) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের ভাষায় মহান আল্লাহ প্রতিবছর এই রাতে সৃষ্টি জগতের ভাগ্য বণ্টন করেন। তাই এর নাম ভাগ্য রজনী বলা হয়েছে। এই রাতটি শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত তথা মধ্য শাবানের রাত। তাই হাদীসে এই রাতকে ليلة النصف من شعبان (মধ্য শাবানের রজনী) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সমাধান কোন পথে?

দীর্ঘকাল থেকে একটি চিহ্নিত মহল শবে বরাতের নামে বাসাবাড়িতে আলোকসজ্জা, কবরে পুষ্প অর্পণ, রাস্তাঘাটে আতশবাজি, ফটকাবাজি, সর্বত্র হালুয়া-রুটি ও মিষ্টি বিতরণের ধুমধামে মত্ত হয়ে যায়। অথচ এসব কর্ম শবে বরাতের মতো পবিত্র রজনীতে কেন, যেকোনো সময়ে তা গর্হিত কাজ, শরীয়ত পরিপন্থী। ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের কুসংস্কারের আদৌ কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। নেই সাহাবায়ে কেরাম ও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের অনুসৃত আমলে এর বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব।

পক্ষান্তরে সাম্প্রতিককালে অপর একটি মহল বিকাশ পাচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। নতুন করে গজিয়ে ওঠা এই মতবাদটি বাড়াবাড়ির চরমসীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। শিরক, বিদআত, হারাম, জায়েয নেই ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারে তারা খুবই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। শবে বরাত পালনে অতি উৎসাহীদের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা শরীয়তের বাস্তব অবস্থাটা বিকৃত করতে শুরু করেছে। জলাঞ্জলী দিচ্ছে কুরআন-হাদীসকে। শবে বরাতের ফযীলত ও করণীয় সম্পর্কীয় বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ হাদীসকে তারা আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করে না। শবে বরাতের কোনো অস্তিত্ব নেই, এতে যা করা হয় সবই বিদআত, শিরক, হারাম এবং এই মর্মে যেসব হাদীস বর্ণিত আছে সবই যয়ীফ, জাল, মিথ্যা ও বানানো হাদীস ইত্যাদি আপত্তিকর ভাষায় লিফলেট, বই-পুস্তক, রকমারি ভিত্তিহীন কাগজপত্র তারা আজ বিতরণ করে যাচ্ছে। তাদের প্রকাশিত অসংখ্য বই-পুস্তকের একটির শিরোনাম হলো– "সঠিক দৃষ্টিকোণে : শবে বরাত" সংকলনে আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান। প্রাপ্তি স্থান, হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী। নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা।

বইটি পড়লে কিছুটা অনুভব করা যাবে মুসলমানদেরকে অমুসলমান বানাতে তারা কত পাকা। কী তাদের রহস্য? কোথায় তাদের গন্তব্য?

বাড়াবাড়ির জালে আবদ্ধ এই দুটি মতবাদের ঠিক মাঝামাঝি অবস্থানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। শবে বরাত পালনে তারা অতি উৎসাহীও না। কুরআন-হাদীস বর্জন করারও তারা পক্ষে না। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে তারা কুরআন সুন্নাহকে স্ব স্ব স্থানে রেখে এর যথাযথ মূল্যায়ন করে যাচ্ছে। এভাবে চলছে যাবতীয় বিষয়ে তাদের আমল ও দাওয়াতী কার্যক্রম। কিন্তু অতি বাড়াবাড়িতে লিপ্ত মতবাদের ষড়যন্ত্রে মুসলিম সমাজ সাম্প্রতিককালে বিব্রত হচ্ছে। এমনকি বিভিন্ন স্থানে তাদের চরমপন্থী আচরণ ও বিভ্রান্তিকর প্রচার-প্রচারণায় মুসলিম সমাজে শান্তিভঙ্গের উপক্রম হয়েছে। ফলে সত্যানুসন্ধিৎসু সাধারণ মানুষ আজ হতাশ। তারা জানতে চায় সমাধান কোন পথে? তাই এ পরিসরে শবে বরাতের কয়েকটি ফাযাইল ও এ রাতের কয়েকটি করণীয় সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের সঠিক অবস্থান অতি সংক্ষেপে আলোকপাতের প্রয়াস পাব।

শবে বরাতের ফযীলত ও করণীয়

মহিমান্বিত শবে বরাতের একাধিক

ফযীলত ও বিভিন্ন করণীয় পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। আছে মুসলিম মনীষীদের উদ্ধৃতি ও আমলের অসীম গুরুত্ব। নিম্নে আমরা অতি সংক্ষেপে পাঠকদের খেদমতে আংশিক পেশ করার চেষ্টা করব।

এক. শবে বরাতে মুক্তি ও রহমতের দ্বার উন্মুক্ত :

শবে বরাত একটি মহিমান্বিত রজনী। এই রজনীতে পরম করুণাময় তাঁর রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। পাপীদেরকে উদার চিত্তে ক্ষমা করেন। এ মর্মে একটি সহীহ হাদীস নিম্নরূপ–

عن معاذ بن جبلؓ عن النبى ﷺ قال: يطلع الله– تبارك وتعالى– إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلالمشرك أومشاحن

"হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলা অর্ধ শাবানের রাতে (শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে) সৃষ্টিকুলের প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও হিংসুক বিদ্বেষী ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন।"

হাদীস সংকলন : উল্লিখিত হাদীসটি সংকলন করেছেন ইমাম ইবনে হিব্বান, স্বীয় হাদীস গ্রন্থ "সহীহ ইবনে হিব্বান" (১২/৪৮১, হাদীস নং ৫৬৬৫) ইমাম তাবরানী, কাবীর (২০/১০৯ হা. নং ২১৫), আওসাত (৭/৬৮ হাদীস নং ৬৭৭৬), বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান (৫/২৭২ হা. নং ৬৬২৮) ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থ।

হাদীসের মান : হাদীস বিশারদ নির্ভরযোগ্য সব উলামায়ে কেরামের গবেষণা মতে এই হাদীসটি 'সহীহ' বিশুদ্ধ। উল্লিখিত বিষয়ে প্রায় এক ডজনের বেশি হাদীস নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে সংকলন করা হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি আছে সহীহ। কয়েকটি আছে 'হাসান' (গ্রহণযোগ্য উত্তম হাদীস) এ ছাড়া কিছু আছে দুর্বল, কিন্তু হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী হাদীস গ্রহণযোগ্য। এ মর্মে যেসব সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণিত আছে তাঁদের অন্যতম কয়েকজন হলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.), হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.), হযরত আয়েশা (রা.), হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.), হযরত আবূ সা'লাবা (রা.), হযরত আবূ হুরায়রা (রা.), হযরত আউফ ইবনে মালেক (রা.), হযরত কাসীর ইবনে মুররাহ (রা.), হযরত উসমান ইবনে আবীল আস (রা.) এবং হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.)।

উপরোল্লিখিত মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-এর হাদীসটি যেসব বিশ্ব বরেণ্য হাদীস বিশারদ ইমাম সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন তাদের অন্যতম হলো, আরব বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গবেষক ও মান্যবর ইমাম হাফেজ নূরুদ্দীন হায়সামী (রহ.) তাঁর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ "মাজমাউয যাওয়ায়েদ"-এ লেখেন–

رواه الطبرانى فى الكبيرو الأوسط ورجالهما ثقات

"ইমাম তাবরানী স্বীয় হাদীস গ্রন্থ 'কাবীর' ও 'আওসাত'-এ তিনি হাদীসটি সংকলন করেছেন। উভয় গ্রন্থে এ হাদীসের বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (ثقه)।" (মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৬৫)

এ ছাড়া আরব ও অনারব অসংখ্য উলামায়ে কেরাম শবে বরাতের হাদীসগুলোকে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। এমনকি লা-মাযহাবী মতবাদের মান্যবর ইমামগণ থেকেও এ ধরনের সুস্পষ্ট মন্তব্য পাওয়া যায়। তাই এ মর্মে তাদেরই কয়েকজন বিশিষ্টজনের মতামত পেশ করা হলো।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানীর মতামত

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী হলেন লা-মাযহাবী মতবাদ অনুসারীদের ধারণা মতে চলমান বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গবেষক। বর্তমানে কথায় কথায় তারা তার উদ্ধৃতি পেশ করে থাকে। তাই তার মতামত এ বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। উপরোল্লিখিত মুআয (রা.)-এর হাদীসটি উল্লেখ করার পর তিনি লেখেন :

حديث صحيح، روى عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا، وهم معاذ بن جبل، أبو ثعلبة الخشني، وعبد الله بن عمرو، وأبو موسى الأشعرى، وأبو هريرة، وأبو بكر الصديق، وعوف بن مالك وعائشة

"হাদীসটি সহীহ, সাহাবায়ে কেরামের বিশাল অংশ বিভিন্ন সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যা একটি অপরটিকে সুদৃঢ় করে। তাঁরা হলেন, মুআয ইবনে জাবাল, আবূ সা'লাবা আল খুশানী, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আবূ মূসা আশআরী, আবূ হুরায়রা, আবূ বকর সিদ্দীক, আউফ ইবনে মালেক ও আয়েশা (রা.)।" (সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা ৩/১৩৫)

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, শবে বরাতের ফযীলত ও করণীয় সম্পর্কীয় গ্রহণযোগ্য হাদীসের সংখ্যা এক ডজনেরও বেশি। শায়খ আলবানী ওগুলো থেকে আটটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রতিটি হাদীসের সাথে তিনি হাদীসের মান নিয়েও আলোচনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি সম্পর্কে যা লিখেছেন তা মাত্র উপরে উল্লেখ করেছি। তিনি ৮টি হাদীস উল্লেখ করার পর সর্বশেষে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস প্রসঙ্গে আলোচনায় শবে বরাত সম্পর্কীয় যাবতীয় হাদীসের মৌলিকভাবে মান বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন –

وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب، والصحة تثبت بأقل منها عددا، ما دامت سالمة من الضعف الشديد، كما هو الشأن فى هذا الحديث، فما نقله الشيخ القاسمى

رحمه اللّٰه –تعالى– في" إصلاح المساجد" (ص ١٠٧) عن أهل التعديل والتجريح، أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح ، فليس مما ينبغي الاعتماد عليه، ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من قبل التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك۔ واللّٰه –تعالى– هو الموفق ۔

"শবে বরাত সম্পর্কীয় হাদীসের ক্ষেত্রে সার কথা হলো, শবে বরাত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো সমষ্টিগতভাবে নিঃসন্দেহে 'সহীহ'। হাদীস অত্যধিক দুর্বল না হলে আরো কমসংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হাদীস সহীহ হিসেবে গণ্য হয়। (আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত) এই হাদীসের মানও তা-ই। অতএব ইসলাহুল মাসাজিদ গ্রন্থপ্রণেতা কাসেমী কতিপয় হাদীস বিশারদের উদ্ধৃতিতে যা লিখেছেন যে, "শবে বরাতের ফযীলতপূর্ণ কোনো সহীহ হাদীস নেই।" তার এই কথার ওপর আস্থা রাখা উচিত হবে না। তবে কেউ যদি এমনটা বলেই ফেলে, তাহলে বুঝতে হবে অতি চঞ্চলতা হেতু এবং হাদীসের বিভিন্ন সূত্র অন্বেষণে যথাযথ প্রচেষ্টা সীমিত হওয়ার কারণেই এমনটা ঘটেছে। আসলে আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দাতা।" (সিলসিলাতুস সহীহা ৩/১৩৮-১৩৯)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার মতামত

আরব বিশ্ব ও লা-মাযহাবী মতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মান্যবর আল্লামা শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) তাঁর বিভিন্ন রচনাবলিতে শবে বরাতের ফযীলত বর্ণনা করেছেন। আক্বীদা সম্পর্কীয় তাঁর অন্যতম রচনা "ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম" গ্রন্থে তিনি লেখেন,

ليلة النصف من شعبان فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها۔۔۔۔ عليه كثير من أهل العلم أو أكثر هم من أصحابنا وغيرهم– على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها، وما يصدق ذلك من الآثار السلفية۔

মধ্য শাবান (শবে বরাত) রাতের ফযীলত সম্পর্কীয় অনেক হাদীস রাসূল (সা.) ও সাহাবা, তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেগুলো শবে বরাতের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। পূর্ববর্তীদের অনেকে এ রাতে নামাযে মগ্ন থাকতেন। ...অসংখ্য বিজ্ঞ আলেম এবং আমাদের অধিকাংশ সাথী এই মতাদর্শে বিশ্বাসী। ইমাম আহমদের (রহ.) উক্তি দ্বারাও তা-ই প্রমাণ করে। কেননা এ বিষয়ে রয়েছে অনেক অনেক হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য পূর্ববর্তীদের অনুসৃত আদর্শ। (ইকতিযা, পৃ. ৪৮৪)

আল্লামা মুবারকপুরীর মতামত

আহলে হাদীস মতাদর্শের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা 'তুহফাতুল আহওয়াযী'তে শবে বরাত সম্পর্কীয় তিরমিযী শরীফে আয়েশা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখেন–

اعلم أنه قدورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن لها أصلا ۔۔۔ فهذه الأحاديث بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شئ۔

"জেনে রেখো! শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কীয় বেশ কয়েকটি হাদীস এসেছে। যা প্রমাণ করে যে, এর ভিত্তি আছে। শরীয়তে শবে বরাতের কোনো ভিত্তি নেই–এমন ধারণা যারা রাখে সামষ্টিকভাবে ওই হাদীসগুলো তাদের বিপক্ষে প্রমাণ বহন করে।" (তুহফা. ৩/৩৮৪-৩৮৫)

বিশেষ আবেদন

আহলে হাদীস মতবাদের অনুসারী ভাইদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনারা বাড়াবাড়ি ছেড়ে পড়ালেখা করুন। হাদীস বর্জন মতবাদ পরিহার করে সুন্নাহ গ্রহণের মতবাদ গ্রহণ করুন। আপনারা ইবনে তাইমিয়া, আলবানী ও মুবারকপুরীর গবেষণা অনুসরণ করেন বলে দাবি করে থাকেন, তাদেরকে শ্রেষ্ঠ গবেষক বলে স্বীকার করেন। আমরা শবে বরাত প্রসঙ্গে তাদের গবেষণাপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেছি। তাই ভেবে দেখুন! সাধারণ জনগণকে আর বিব্রত ও বিড়ম্বনায় না ফেলে আপনারা হাদীস মানার প্রতিজ্ঞা করুন।

দুই . শবে বরাত ভাগ্য বণ্টনের রাত

শবে বরাতের অন্যতম একটি ফযীলত হলো এই রাতে সৃষ্টিজগতের ভাগ্য বণ্টন করা হয়। সূরায়ে দুখানের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন –

إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ۔ فيها يفرق كل أمر حكيم

"নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি মুবারক রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এই রাতে হেকমতপূর্ণ সব বিষয় সিদ্ধান্ত করা হয়।" (দুখান ২-৩)

এই রাতে হেকমতপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ের ভাগ করা বা নির্ধারণ করা হয়। তাই এই রাতকে ভাগ্য রজনী বা মুবারক রাত বলা হয়। কুরআনে কারীমের উপরোক্ত আয়াতের আলোকে যে রাতে ভাগ্য বণ্টন করা হয় ওই রাতের নাম হলো ليلة مباركة বা মুবারক রাত।

মুবারক রাত কোন রাতকে বলা হবে? কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, মুবারক রাত হলো শবে কদর। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ করেছেন মুবারক রাতে কুরআন নাযিল করেছেন। তাই ওই রাতই মুবারক রাত হিসেবে গণ্য হবে, যে রাতে কুরআন নাযিল করা

হয়েছে। আর সূরায়ে কদর এ আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেন إنا أنزلناه في ليلة القدر "নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি শবে কদরে।" (কদর-১) এতে পরিষ্কার বোঝা যায়, মুবারক রাত বলতে শবে কদর। তাই শবে কদরেই ভাগ্য বণ্টন হয়। অতএব শবে কদরের নামই হবে ليلة مباركة (মুবারক রাত)।

এই বিষয়ের নিরসন হিসেবে উলামায়ে কেরাম বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। সংক্ষেপ কথা হলো, শবে কদর শবে বরাত দু'টিই মুবারক রাত। তবে উল্লিখিত আয়াতে অনেক মুফাসসিরের ব্যাখ্যা মতে শবে বরাতকে মুবারক রাত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর কুরআনে কারীমও দুই রাতেই অবতরণ করেছেন। হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) লেখেন–

نزول واقعی دو مرتبہ ہوا، ایک رات میں حکم نزول قرآن ہوا اور دوسری میں اسکا وقوع ہوا، مطلب یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں مراد حقیقی نزول ہے اور انا انزلنا ہ فی لیلۃ مبارکۃ میں حکمی نزول ہے جو کہ شب براءت میں ہوا ہے۔

কুরআন মূলত দুই বার নাযিল হয়েছে। এক রাতে কুরআন নাযিলের حكم (সিদ্ধান্ত) হয়েছে। দ্বিতীয় রাতে তার বাস্তবায়ন হয়েছে। মোটকথা, কদরের রাতে কুরআন নাযিল করেছি এর অর্থ হলো, নাযিল করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছি। আর মুবারক রাতে নাযিল করেছি এর অর্থ হলো নাযিল করার সিদ্ধান্ত শবে বরাতে গ্রহণ করা হয়েছে। (ওয়ায ও তাবলীগ-পৃ. ৮)

তাফসীর গ্রন্থসমূহে সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে যেভাবে পাওয়া যায় এতেও এমনটিই বোঝা যায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

إن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان، ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر وروى أن الله تعالى أنزل كل القرآن من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ووقع الفراغ في ليلة القدر ـ

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মধ্য শাবান রাতে (শবে বরাতে) যাবতীয় সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত ফায়সালা করেন। আর শবে কদরে তা নির্দিষ্ট দায়িত্বশীলের নিকট অর্পণ করেন। ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা লওহে মাহফূজ থেকে পূর্ণ কুরআনে কারীম একত্রে অবতরণ করেন শবে বরাতে। আর অবতরণের ধারা সমাপ্ত করেন শবে কদরে।" (লুবাব, আবু হাফস উমর ১৭/৩১১, দেখুন তাফসীরে রাযী ২৭/২৩৯, কুরতুবী ১৬/১২৬)

বলাবাহুল্য, তাফসীর বিশারদ ইমামদের ব্যাখ্যা থেকে প্রমাণ হয় শবে কদর এবং শবে বরাত উভয় রাতেই কুরআন নাযিল হয়েছে। তবে শবে বরাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এতে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভাগ বণ্টন করা হয়। তাই এর নাম মুবারক রাত বা ভাগ্য রজনী। (দেখুন তাফসীরে কাশশাফ ৪/২৬৪, রূহুল মাআনী ৯/১১২)

মোটকথা, উপরোক্ত আয়াতের আলোকে বোঝা যায়, শবে বরাতে ভাগ্য বণ্টন করা হয়। আর কুরআনের ভাষায় এরই অপর নাম ليلة مباركة মুবারক রাত। শবে বরাতে ভাগ্য বণ্টন হয়, এ বিষয়ে বর্ণিত দু'টি বর্ণনা উল্লেখ করে এই পর্বের ইতি টানব।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলেন, মধ্য শাবানের রাতের কার্যক্রম হলো, এই বছর যতজন জন্মগ্রহণ করবে এবং মারা যাবে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। এই রাতেই মানুষের আমল পৌঁছানো হয়। এতেই তাদের রিযিকের বাজেট করা হয়। (ফাযায়েলে আওকাত, বায়হাকী হা. নং ২৬, মেশকাত ১/১১৫ হা. নং ১৩০৫ হাদীস দুর্বল গ্রহণযোগ্য)

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত, যখন শাবানের পঞ্চদশ রজনী আগত হয়, আল্লাহর পক্ষ হতে মৃত্যুর দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতার নিকট একটি তালিকা প্রদান করে তাদের প্রাণ হরণ করার নির্দেশ জারি করা হয়। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৪/৩১৭ হা. ৭৯২৫ হাদীস গ্রহণযোগ্য)

উল্লেখ্য, বর্ণনা দুটির মাধ্যমেও বোঝা যায়, ভাগ্য রজনী বা মুবারক রাত বলতে শবে বরাতেরই অপর নাম, যা এই রাতের মর্যাদা ও গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। অনুপ্রাণিত করে এই রাতে ইবাদত বন্দেগী করার প্রতি। তবে এ বিষয়ে খুব বাড়াবাড়ি করাও সমীচীন নয়। বরং শবে কদরের মর্যাদা শবে বরাত অপেক্ষা অনেক বেশি। অবশ্য শবে বরাতও মর্যাদাপূর্ণ এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তিন. শবে বরাতে রাত জেগে ইবাদত করা ও পরদিন রোযা রাখা

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বেশ কয়েকটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে শবে বরাতে মহান আল্লাহ রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন এবং এ রাতে উদারচিত্তে ক্ষমা করেন। অতএব ওই রাতে এমন কাজই করা সমীচীন হবে, যা আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা পাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগী হবে। আর এমন সব কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে, যা রহমত ও ক্ষমা লাভের অন্তরায় হবে। আল্লাহর রহমত লাভে সহযোগিতা হয় এমন কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কয়েকটি কাজ হলো একাগ্রচিত্তে নফল নামায পড়া, মনযোগের সাথে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা, রাত জেগে অশ্রুবিজড়িত অবস্থায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, মঙ্গল কামনা ও দিনে রোযা রাখা ইত্যাদি। এ পরিসরে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করার প্রয়াস পাব।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক

রাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। এতে তিনি এমন দীর্ঘ সেজদা করলেন যে, আমার ধারণা হলো তিনি মারাই গিয়েছেন। আমি যখন অবলোকন করি, তখন বিছানা থেকে উঠে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নাড়া দিই। এতে করে তাঁকে সচেতন বুঝতে পারি, আমার বিশ্বাস হলো তিনি জীবিত আছেন। অতঃপর নিজ বিছানায় ফিরে এলাম। তিনি সেজদা থেকে মাথা উঠালেন। নামায সমাপ্ত করে তিনি আমাকে বললেন, হে আয়েশা! তোমার কী ধারণা হয়েছে? নবী কী তোমার সাথে সীমালঙ্ঘন করেছে? আমি বলি, জি না, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তবে আপনার দীর্ঘ সেজদার কারণে আমার মনে হয়েছে আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

অতঃপর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি জানো আজকের এ রাতটি কোন রাত? আমি বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বিষয়ে অধিক জ্ঞাত। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

هذه ليلة النصف من شعبان ،إن الله –عزوجل– يطلع على عباده فى ليلة النصف من شعبان ، فيغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين، ويؤخر أهل الحقد كما هم۔

"এ রাতটি মধ্য শাবানের রাত (শবে বরাত)। এ রাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশেষ করুণার দৃষ্টি দেন, অনুগ্রহপ্রার্থীদের দয়া করেন, তবে হিংসুক ব্যক্তিদের স্বীয় অবস্থার ওপর ছেড়ে দেন।" (বায়হাকী শুআবুল ঈমান ৩/৩৮৩, হা. ৩৮৩৫, আততারগীব ওয়াত তারহীব ২/৭৩-৭৪)

ইমাম বায়হাকী (রহ.) উল্লিখিত হাদীসটি সংকলন করেছেন। তিনি এ হাদীসটি সম্পর্কে 'هذا مرسل جيد' গ্রহণ করার মতো উত্তম মুরসাল হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া ফাযাইলের ক্ষেত্রে এ ধরনের হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়াতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। অনুরূপভাবে হাদীসটি উল্লিখিত কিতাবেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে মারফূভাবে (সরাসরি ধারাবাহিকতার সাথে) বর্ণিত আছে। (দেখুন ৩/৩৮৩ হা. ৩৮৩৭, হাদীস গ্রহণযোগ্য) সাথে সাথে শবে বরাতের ফযীলতপূর্ণ অন্যান্য হাদীসের সমন্বয়ে এই হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা আরো বৃদ্ধি পাবে। আরো লক্ষণীয় বিষয় হলো এই হাদীসের সমঅর্থে স্বস্থিরে নামায আদায় করার অসংখ্য বর্ণনা বুখারী ও মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে। অতএব, এই হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি আমাদের নামায কেমন হতে হবে। কেমন হতে হবে শবে বরাত ও অন্যান্য নফল নামায। কিভাবে পড়তে হয় আল্লাহকে পাওয়ার জন্য নামায। তাই নামায পড়ার ক্ষেত্রে যাবতীয় অবহেলা ও লোকদেখানোর মানসিকতা পরিহার করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ অনুসরণে আমরা বদ্ধপরিকর হই।

সুনানে ইবনে মাজায় হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا ، فيقول: ألا من مستغفر لى فأغفر له،ألا مسترزق فأرزقه ، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔

পনের শাবানের রাত যখন আসে, তোমরা এই রাতটি ইবাদত বন্দেগীতে পালন করো এবং দিনের বেলা রোযা রাখো। কেননা, এ রাতে সূর্যাস্তের পর আল্লাহ তা'আলা প্রথম আসমানে আসেন আর বলেন, "কোনো ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। কোনো রিযিক অন্বেষণকারী আছে কি? আমি তাকে রিযিক প্রদান করব। আছে কি কোনো রোগাক্রান্ত? আমি তাকে আরোগ্য দান করব। এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে তাদের ডাকতে থাকেন।" (ইবনে মাজাহ-পৃ. ৯৯ হা. ১৩৮৮, বায়হাকী শুআবুল ঈমান ৩/৩৭৮ হা. ৩৮২২)

হাদীস বিশারদ ইমামগণের গবেষণা মতে এই হাদীসের সব বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (ثقه)। তবে এতে শুধু ইবনে আবী সাবূরা নামক এক ব্যক্তি রয়েছে, তার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে হাদীসটি আংশিক সামান্য দুর্বল বলে গণ্য হবে। এ ধরনের দুর্বল হাদীস ফাযায়েলের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। শবে বরাত শীর্ষক হাদীসগুলোকে সমষ্টিগতভাবে হাদীস বিশারদ ইমামগণ বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন, যা ইতোমধ্যেই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এ পরিসরে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রণিধানযোগ্য। তা হলো, উপরোল্লিখিত হাদীসে শাবানের পনের তারিখ দিনে রোযা রাখার কথা বলা হয়েছে। আর শাবান মাসে বেশি বেশি রোযা রাখার কথা বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। এছাড়া পনের তারিখ আইয়ামে বীয বা মধ্য মাসের তিন দিনের এক দিন। আর এই তিন দিন তথা ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিয়মিত রোযা রাখতেন, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। এই হিসেবে বলা যায় উপরে বর্ণিত হাদীসটির ভিত্তি অতি মজবুত ও গ্রহণযোগ্য।

এ ছাড়া শাবান মাসে রোযা রাখার গুরুত্ব সম্পর্কীয় অনেক বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন –

ما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته فى شهر أكثر صياما منه فى شعبان ـ

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে রমযান মাস ব্যতীত পূর্ণ মাস রোযা রাখতে কখনো দেখিনি। আর (রমযান ব্যতীত) শা'বান মাসের তুলনায় বেশি রোযা অন্য কোনো মাসে রাখতে তাঁকে দেখিনি।" (বুখারী ১/২৬৪ হা. ১৯৬৯, মুসলিম ১/৩৬৫ হা. ১১৫৬)

মোটকথা, শাবানের পনের তারিখ হিসেবে রোযা রাখার কথা নির্দিষ্টভাবে হাদীসে উল্লেখ আছে। আছে আইয়ামে বীয হিসেবে ১৫ তারিখে রোযা রাখার গুরুত্ব। সাথে রয়েছে মুসলিম মিল্লাতে অনুসৃত আমল। আর শাবান মাসে রোযা রাখার অতিরিক্ত গুরুত্ব তো আছেই। সব মিলিয়ে শাবানের ১৫ তারিখ রোযা রাখার কোনো ভিত্তি নেই, বিদআত ইত্যাদি আজগুবি কথা যারা ছড়াচ্ছে তাদের বক্তব্য যে কত ভিত্তিহীন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

শবে বরাতে যা বর্জনীয়

এই রাতে নির্দিষ্ট কোনো আমল বা নির্দিষ্ট সংখ্যায় কোনো কাজকর্ম কুরআন-হাদীসে বর্ণিত নেই। নেই নামাযের কোনো নির্দিষ্ট রাক'আত সংখ্যা, ভিন্ন কোনো পদ্ধতি। এই রাতে নামায, দু'আ ও কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি নফল আমলের অন্তর্ভুক্ত। আর যাবতীয় নফল আমল আপন আপন ঘরে একাগ্রচিত্তে পড়া উত্তম। তাই এই রাতে নফল নামায আদায়ের জন্য দলে দলে মসজিদে জমকাল আনুষ্ঠানিকতা সৃষ্টি করা ঠিক নয়। তবে কোনো ধরনের আয়োজন ও আনুষ্ঠানিকতা ব্যতীত মসজিদ নামাযের স্থান হিসেবে এতে সমবেত হয়ে গেলে কোনো আপত্তির কারণ নেই।

অনুরূপভাবে হালুয়া-রুটি, মিষ্টি বিতরণ এবং বাসাবাড়ি, মসজিদ, দোকান, অফিস ইত্যাদিতে আলোকসজ্জা করা, ফটকাবাজি, আতশবাজি, কবরস্থানে পুষ্প অর্পণ ও আলোকসজ্জা করা ইত্যাদির কোনো ভিত্তি নেই। নেই সাহাবায়ে কেরাম ও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের অনুসৃত আমলে এর কোনো প্রমাণ। তাই এ সব কুসংস্কার পরিপূর্ণরূপে পরিহার করা অত্যন্ত জরুরি। তবে কবরস্থানবিষয়ক একটি হাদীস পর্যালোচনা করে এ পরিসরের সমাপ্তি রেখা টানব।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এক রাতে বিছানায় পাইনি। তখন খোঁজ করার জন্য বের হয়ে তাঁকে জান্নাতুল বাক্বীতে (কবরস্থানে) পাই। (এমতাবস্থায় কথা প্রসঙ্গে) তিনি বলেন–

إن اللّٰـه– تبارك وتعالى– ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب

"মধ্য শাবান বা শাবানের পঞ্চদশ রাতে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে আগমন করেন এবং বনু কালব গোত্রের ছাগল ভেড়ার পশমের চেয়েও অধিক সংখ্যক লোককে তিনি ক্ষমা করে দেন।" (তিরমিযী ১/১৫৬ হা. ৭৩৯, ইবনে মাজাহ-পৃ. ৯৯ হা. ১৩৮৯)

হাদীসটি শবে বরাতের অন্যান্য হাদীসের সমন্বয়ে সহীহ পর্যায়ে গণ্য হবে। অবশ্য মূল সূত্রে এক স্থানে انقطاع (ধারাবাহিকতা বিঘ্ন) হয়েছে। তবে পূর্বে উল্লিখিত শবে বরাত সম্পর্কীয় অসংখ্য হাদীসের সমন্বয়ে সমষ্টিগতভাবে হাদীসটি সহীহ পর্যায়ে গণ্য হবে। তাই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য।

এই হাদীসে বিশেষভাবে লক্ষণীয় একটি বিষয় হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শবে বরাতে জান্নাতুল বাক্বী (কবরস্থানে) গিয়েছিলেন। এতে কবরস্থানে যাওয়া ওই রাতের একটি উল্লেখযোগ্য আমল হিসেবে প্রমাণ বহন করে। আসলে সত্যি বলতে উপরোল্লিখিত হাদীসের আলোকে শবে বরাতে কবরস্থানে যাওয়ার অনুমতি অবশ্যই আছে। বরং অনেকের গবেষণা মতে ওই রাতে কবরস্থানে যেয়ে মৃত ব্যক্তিদের জন্য মাগফিরাত ও মুক্তি কামনা করা মুস্তাহাব ও একটি ভালো কাজ। (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী ৫/৩৫০)

এ পরিসরে বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওই রাতে কবরস্থানে গিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু তিনি তো একাকী গিয়েছিলেন। গিয়ে ছিলেন নির্জনে অনানুষ্ঠানিকভাবে। তাই কবর যিয়ারতের নামে দলবদ্ধ হওয়া, সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান করা, জশনে জুলুসে জমকাল অনুষ্ঠানে পরিণত করা, কবরে আলোকসজ্জা করা, আতশবাজি, পুষ্পঅর্পণে লিপ্ত হওয়া, বিনোদন ও নারী-পুরুষের মিলনমেলায় পরিণত করা ইত্যাদি শবে বরাতের নামে বাড়াবাড়ি ও ধর্মবিকৃতির নামান্তর। এ সবই ইসলামী আদর্শ বিবর্জিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবাগণের অনুসৃত আমল থেকে দূরে-অনেক দূরে। তাই শরীয়তের যাবতীয় ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও চরমপন্থা পরিহার করে শরীয়তকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা একান্ত অপরিহার্য। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বোঝা ও আমল করার তৌফিক দিন। শাবান মাসে অনুষ্ঠিত পাপাচার হতে মুক্ত থেকে এ মাসের যথাযথ মূল্যায়ন ও কল্যাণ লাভে সবাইকে ধন্য করুন। আমীন।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর মাধ্যমে
তাবলীগী কাজের সূচনা-৩

মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী

হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর যুগে তাবলীগি কাজের পরিধি ও বিস্তৃতি

মাওলানা ইউসুফ (রহ.) ১৩৩৫ হিজরীর ২৫ শে জুমাদাল উলা মুতাবিক ২০ শে মার্চ ১৯১৭ সালে কান্ধালায় জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুরে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। মাওলানা ইউসুফ সাত বছর বয়সে কুরআনে কারীম হিফয করেন। পিতা-মাতার বিশেষ নেগরানীতে তার তারবিয়ত চলতে থাকে। সাধারণ ছাত্রদের সাথে তিনি সব কাজে শরীক থাকতেন। এভাবে শৈশব থেকেই তার মধ্যে সচেতনতা, দায়িত্ববোধ, যিম্মাদারীর অনুভূতি এবং ইলম অন্বেষণের আগ্রহ পয়দা হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র জীবনী এবং আল্লাহর রাস্তায় তাদের জীবন উৎসর্গ ও কুরবানীর ঘটনার সাথে তার গভীর অনুরাগ ছিল।

মাওলানা ইউসুফ সাহেব কারী মুঈনুদ্দীন সাহেবের নিকট থেকে ইলমে তাজবীদ শিক্ষা করেন এবং ১১ বছর বয়সে স্বীয় পিতার নিকট সাহারানপুরে আরবী কিতাবাদী পাঠ শুরু করেন।

মাওলানা ইউসুফ সাহেবের আসল মাশগালাহ তো ইলমের সাথেই ছিল। কিন্তু যখন তিনি তাবলীগের যিম্মাদারীতে জড়িয়ে গেলেন তখন ধারণা করা হচ্ছিল যে, এবার হয়তো তার ইলমী চর্চায় কিছুটা ছেদ পড়বে। কিন্তু তিনি তার ইলমী পিপাসা নিবারণে ব্যস্ত রইলেন এবং শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও বড় বড় কিতাবাদী রচনা করলেন। শিক্ষকতার সময়েই তিনি তাহাবী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেখার কাজ শুরু করেছিলেন, যা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চালু ছিল। কিতাবটির দুই খণ্ড তার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল আর তৃতীয় খণ্ড তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। সাহাবায়ে কেরামের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত তার আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ হচ্ছে 'হায়াতুস সাহাবা'। আরবী ভাষায় রচিত প্রায় ২ হাজার পৃষ্ঠার এই কিতাব তার গভীর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে। কিতাবটি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

মাওলানা ইউসুফ (রহ.) যেভাবে আমীর নির্বাচিত হলেন

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) জীবনের শেষ মুহূর্তে মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহ.), মাওলানা যফর আহমাদ উসমানী (রহ.) এবং শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-কে বললেন, এই কাজের জন্য আমার জীবদ্দশাতেই কাউকে মনোনীত করে দাও, যাতে আমি নিশ্চিত হয়ে যেতে পারি। সুতরাং উপরোক্ত বুযুর্গত্রয় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে মাওলানা ইউসুফ সাহেবকে জামা'আতের আমীর মনোনীত করলেন। কেউ কেউ আপত্তি করল যে, মাওলানা ইউসুফ সাহেব নিঃসন্দেহে অনেক বড় আলেম এবং তাকওয়ার অধিকারী কিন্তু এ কাজের সাথে তার সম্পৃক্ততা কম। কিন্তু যে রাতে মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) ইন্তিকাল করলেন সেদিন ফজরের পরে মাওলানা ইউসুফ সাহেব যে বয়ান রাখলেন তা শুনে সকলে হতবাক হয়ে গেল। কাল আর আজকের মধ্যে আসমান-যমীন পার্থক্য ছিল। পিতার দাওয়াতী নিসবত পুরোটাই তার মধ্যে এসে গিয়েছিল। সাধারণত এ রকম খুব কমই হয়ে থাকে। আর যখন হয় তখন আকল হয়রান হয়ে যায়।

মাওলানা ইউসুফ সাহেব কথা, কাজ, ইলম এবং আমলের ক্ষেত্রে সে যুগে আল্লাহর দলিল ছিলেন। জল-স্থল সর্বত্র তার বিচরণ ছিল। তার সফরের সামনে দুনিয়া তখন হাতের মুঠোয় ছিল। তার নিজের কোনো ইচ্ছা ছিল না। নিজস্ব কোনো খাহেশ ছিল না। আল্লাহ তা'আলার আহকামের সামনে তিনি ছিলেন সমর্পিত। তার পুরা জীবন পিতা ও চাচাত ভাই শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর মতো তাবলীগের জন্য ওয়াকফ ছিল।

তার জীবনের উদ্দেশ্য একটাই ছিল যে, মুসলমানকে সৃষ্টি করা হয়েছে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের জন্য। সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই বেঁচে থাকে, তার সন্তুষ্টির জন্য জীবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হয় না। পার্থিব বিষয়াবলি তার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না। তাই সে শত বিপদেও প্রাণ খুলে হাসতে পারে, আর ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ দরিয়ায়ও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

মুর্খতা, পশ্চিমা সভ্যতার চাকচিক্য আর অমাবশ্যার অমানিশা তার পথরোধ করতে পারে না। পরিস্থিতির প্রতিকূলতা তার জন্য প্রতিবন্ধক হয় না। বিপদ, মুসীবতের পাহাড় তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে পারে না। তারা অন্ধকারে ঈমানের মশাল প্রজ্জলিত করে মৃত অন্তরে সঞ্জীবনী সুধা ঢালে। দুনিয়ার পংকিলতায় নিমজ্জিত বনী আদমকে আখেরাতের ফিকিরে উজ্জীবিত করে।

এই ফিকিরেই তিনি সফরের পর সফর করেছেন আর তাবলীগি সফরেই এই দুনিয়াকে আল বিদা জানিয়েছেন।

মাওলানা ইউসুফ (রহ.) পিতার ইন্তিকালের পরে প্রায় ২১ বছর তাবলীগের জিম্মাদারী পালন করেছেন। তার জীবন ছিল একটা চলমান জিহাদ। তাবলীগের কাজে এতটাই মগ্ন থাকতেন যে, একবার তার পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়ল, এই অবস্থায় বেগম সাহেবা সফরে যেতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যদি তাকে তাবলীগের কাজের জন্য কবুল করেন তাহলে তাকে জীবিত রাখবেন। আর তা না হলে তার জীবন-মৃত্যু নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই। এই বলে সফরে চলে গেলেন।

এই একুশ বছরে কোনো ব্যক্তিগত সফর করেননি। সব সময় তার একই চিন্তা, একই ফিকির যে, উম্মতের মধ্যে যেন এই একীন পয়দা হয়ে যায় যে, যা কিছু হয় আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়, বান্দা থেকে কিছু হয় না। এই ফিকিরেই লাহোরে তার ইন্তিকাল হয়ে গেল। হযরত শাইখুল হাদীস (রহ.) যিনি বয়সে তার চেয়ে বড় ছিলেন এবং ইলম-আমলেও শীর্ষে ছিলেন, তার মৃত্যুর পরে বললেন- মাওলানা ইউসুফ এমন এক লাফ দিয়েছেন যে, এক লাফে আসমানে পৌঁছে গেছেন আর আমি যমীনে বসে তা দেখতে রয়ে গেছি।

বস্তুত এই সন্তান ছিলেন বাপ-দাদার ইখলাসের ফসল। যে কাজ মজদুরদেরকে পানি পান করানো, পারিশ্রমিক দিয়ে তাদেরকে নামাযী বানানো এবং চৌধুরীদের হাতে বেদম প্রহারের দ্বারা শুরু হয়েছিল তার জগৎজোড়া খ্যাতির আজ এই অবস্থা যে, দুনিয়াতে আজ এমন কোনো দেশ নেই, যেখানে তাবলীগের সাথীদের কদম পড়েনি। দাওয়াত ও তাবলীগের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা ইউসুফ (রহ.) বলেন, এই তাহরীকের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং তার কুদরতী ভাণ্ডার থেকে সরাসরি উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা পয়দা হয়ে যায়। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে তরীকা নিয়ে এসেছেন সেই তরীকা যখন আমাদের জীবনে আসবে তখন আল্লাহ তা'আলা নকশার মাধ্যমে কামিয়াবী দান করে দেখিয়ে দেবেন। কালেমা তাইয়িবার মধ্যেই নিজের একীন, নিজের জযবা এবং তরীকা পরিবর্তন করার দাবি বিদ্যমান রয়েছে।

ভবিষ্যৎ বলে দিয়েছে যে, জামা'আতের এই মাকসাদ কতটুকু বাস্তব ছিল। এই তাহরীক, তাবলীগের এই কর্মকাণ্ড দিনদিন বৃদ্ধি পেয়েছে, তার এলাকা বিস্তৃত হয়েছে এবং তার ফয়েয-বরকত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া আর আরব সর্বত্রই আজ এই কাজের ব্যপ্তি।

এ সম্পর্কে মাওলানা মনজুর নুমানী (রহ.) বলেন, মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর ইন্তিকালের কয়েক মাস পরে মুরাদাবাদে বড় আকারে একটি তাবলীগি ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। বয়ানের পরে তাশকীল শুরু হলে খুব কম লোকই নাম লেখাল। মানুষের এই নির্লিপ্ততা দেখে মাওলানা ইউসুফ সাহেবের জালাল এসে গেল। তিনি একদম উঠে আমার হাত থেকে মাইক নিয়ে বললেন, আজ আপনারা বিজনোর, চাঁদপুর আর রায়পুরের মতো কাছাকাছি এলাকায় যাওয়ার জন্য নাম লেখানোর সাহস পাচ্ছেন না। অথচ এমন এক সময় আসবে, যখন আপনারা সিরিয়া যাবেন, ইরাক যাবেন, মিসর যাবেন। কিন্তু তখন তো এই কাজ ব্যাপক হয়ে যাবে, তাই সাওয়াবও হ্রাস পাবে। হযরত মাওলানার এই জালালী বয়ানে আরো কিছু লোক নাম লেখাল। কিন্তু আমার মাথায় এটা ধরল না যে, হযরত মাওলানা এদের সিরিয়া, ইরাক সফরের কথা বলছেন, এরা তো এখানের জন্যই তৈরি হচ্ছে না, বিদেশে যাবে কিভাবে! কিন্তু আল্লাহ পাকের কুদরত বোঝা বড় দায়। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মাওলানার সেই কথা বাস্তব হয়ে দেখা দিল আর আরবের এই দেশগুলোতে সর্বপ্রথম জামা'আত এই মুরাদাবাদ থেকেই রওনা হলো।

মাওলানা ইউসুফ সাহেব অত্যন্ত দৃঢ়তা, ধৈর্য্য ও একাগ্রতার সাথে এই কাজকে আগে বাড়ালেন। তার দিলে দ্বীনের দরদ ছিল। উম্মতের জন্য তড়প ছিল। আল্লাহ তা'আলার ওপর পরিপূর্ণ ভরসা ছিল। আর বাস্তবতা হলো তিনি আল্লাহ তা'আলার হাকীকত ও মারেফাতের ফয়েজে পরিপূর্ণ ছিলেন। তাই এই আন্দোলন স্রোতের বেগে অগ্রগতি লাভ করতে লাগল।

মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর যুগে তাবলীগের আওয়াজ প্রতিটি জনপদে ও বস্তিতে গুঞ্জরিত হতে লাগল। ১৯৪৮ সালে একটি জামা'আত গিয়েছিল উত্তর প্রদেশের বেরেলি জেলার আনোলা নামক স্থানে। জামা'আতের সাথী ছিল পাঁচজন, যাদের মধ্যে তিনজন ছিল মেওয়াতী। এর আগে কখনো সেখানে জামা'আত যায়নি। জামা'আতের সাথীরা সেখানে মেহনত করার কারণে চারিদিকে তার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের কালেমা, নামায ইত্যাদি সহীহ শুদ্ধ করার মেহনত জারি হয়ে গেল। কিন্তু কিছু লোক এর বিরোধিতা করলেও অধিকাংশ লোক এটাকে খুশিমনে গ্রহণ করল।

মাওলানা ইউসুফ সাহেবের সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সর্বপ্রথম জামা'আত প্রেরণ

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে করাচিতে

ইজতিমা অনুষ্ঠিত হলো। সেখানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাওলানা ইউসুফ সাহেব পাকিস্তানে তাবলীগের মেহনতকে জোরদার করার প্রোগ্রাম বানালেন। রাওয়ালপিন্ডি, পেশাওয়ার, সিখর, ঢাকা, চিটাগাং, খুলনা এবং রায়ব্যান্ডে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ইজতিমা অনুষ্ঠিত হলো। এভাবে মাওলানা ইউসুফ সাহেব পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বাংলাদেশে ব্যাপক সফর করলেন এবং প্রতিদিন কয়েকটি ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলেন। ১৯৬৪ সালে শেষ হজ থেকে ফিরে আসার পর তিনি শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর সাথে পাকিস্তান সফর করলেন। আরব দেশগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম কাজ শুরু হলো মিসরে। ১৯৪৬ সালে মাওলানা ইউসুফ সাহেব হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ বলিয়াবী, মাওলানা মুফতী যাইনুল আবেদীন, মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান এবং মাওলানা ইবরাহীম সাহেবের সমন্বয়ে একটি জামা'আত তৈরি করে মিসরে প্রেরণ করলেন। তারা সেখানে প্রায় ৫ মাসেরও বেশি সময় ধরে কাজ করলেন।

হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর মাধ্যমে ১৯৫১ সালে সর্বপ্রথম সুদানে একটি জামা'আত গেল। ইরাকে প্রথম জামা'আত নিয়ে গেলেন মাওলানা উমর পালনপুরী এবং মাওলানা জিয়াউদ্দীন (রহ.)। সিরিয়ায় প্রথম জামা'আত গেল মাওলানা ঈসা পালনপুরী এবং মাওলানা উমর পালনপুরীর নেতৃত্বে ১৯৬১ সালে। লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া এবং মরক্কোতেও সে সময়ে কাজ শুরু হয়। ১৯৫২ সালে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব কেনিয়া, উগান্ডা, তাঞ্জানিয়া, জাম্বিয়া, মোজাম্বিক, দক্ষিণ আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকা, রোডেশিয়া এবং মরিশাস প্রভৃতি এলাকায় জামা'আত প্রেরণ করেন এবং সেসব এলাকায় কাজ শুরু হয়। এই সময়েই জাপান, আমেরিকা এবং ইউরোপীয় দেশসমূহে কাজ শুরু হয়। এভাবে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবের জীবদ্দশাতেই সারা বিশ্বজুড়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে।

মাওলানা ইউসুফ সাহেব আরব দেশগুলোতেও তাবলীগি কাজের সূচনা করেন। বিশেষ করে হেজায তথা সৌদি আরবে খুব জোরেশোরে শুরু করেন। হেজায যেহেতু সারা দুনিয়ার মুসলমানদের কেন্দ্রভূমি এবং সারা বিশ্বের মুসলমানদের নেতৃবৃন্দ হজের সময় সেখানে একত্রিত হন তাই মাওলানা ইউসুফ সাহেব সেখানেই মজবুতভাবে তাবলীগের কাজের বুনিয়াদ রাখতে চাইলেন। তিনি চিঠিপত্র এবং বয়ান ও তাকরীরের মাধ্যমে এদিকে উলামায়ে আরবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলেন। এ জন্য তিনি একটি নেযাম তৈরি করলেন। যথা– (১) বড় বড় স্টেশন এবং জংশন যেখানে হাজী সাহেবানরা একত্রিত হন সেখানে তাবলীগের কাজ শুরু করা হোক। (২) এয়ারপোর্ট এবং বন্দরসমূহে গাশতের ব্যবস্থা করা হোক। (৩) জাহাজের মধ্যে তালীম এবং মুযাকারা চালু করা হোক।

হেজাযে কাজ করার জন্য সর্বপ্রথম যে জামা'আত রওনা হলো তাতে মুরাদাবাদ এবং দিল্লির লোকেরা ছিল।

১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় জামা'আত রওনা হলো। এরপরে এই সিলসিলা চালু হয়ে গেল। মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ এবং তার আশপাশের এলাকায় গাশত শুরু হলো। উপমহাদেশ থেকে যারা হজে যেতেন তারাও এতে অংশ নিতে লাগলেন। আরবের সব শ্রেণীর লোকের সামনে এর পরিচিতি তুলে ধরা হলো। এসব করতে গিয়ে কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হলেও ধীরে ধীরে তা দূর হয়ে গেল। এই কাজের জন্য আরবী ভাষায় পারদর্শী লোকদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মাওলানা আলী মিয়া নদভী (রহ.) আরবীতে দক্ষ হওয়ার কারণে তার দ্বারা খুব কাজ হলো। শুধুমাত্র তার একার মেহনতের কারণে হেজাযে এই কাজ খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। সৌদি আলেমরা খুবই প্রভাবান্বিত হলেন। ১৯৪৯ সালে মাওলানা মনযুর নুমানী এবং আল্লামা সুলাইমান নদভী হজের জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলে তারা বিভিন্ন ইজতিমায় বয়ান করে করে তাবলীগের কাজের জন্য রাস্তা আরো পরিষ্কার করে দিলেন। তাছাড়া মক্কা শরীফে অবস্থিত মাদরাসায়ে ছওলাতিয়া কর্তৃপক্ষ সাহায্য করায় কাজ আরো গতি লাভ করে।

বিভিন্ন আরব দেশে কাজের সূচনা

হেজাযে যখন দাওয়াতের কাজের আশাব্যঞ্জক ফলাফল পরিলক্ষিত হলো তখন অন্যান্য আরব দেশেও তাবলীগের মেহনত শুরু করা হলো। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচণ্ড বাধা এবং বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হলেও আল্লাহ পাকের মেহেরবানী এবং সাহায্যে সেসব আস্তে আস্তে দূরীভূত হয়ে গেল। এ সম্পর্কে শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) লেখেন, তাবলীগি বন্ধুরা বিদেশের সফর সাধারণত হারামাইন শরীফ থেকেই শুরু করতেন। চাই তারা আরবের হোন কিংবা ইউরোপের। মদীনা থেকেই সাধারণত যাত্রা শুরু হতো। এতে আধ্যাত্মিক ফয়েজ-বরকত লাভ করা ছাড়াও কারেন্সি ইত্যাদির ব্যাপারেও কিছুটা নিরাপত্তা মিলত। এছাড়া আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আরেকটি সাহায্য এই হতো যে, হজের প্রাক্কালে যেহেতু বিভিন্ন দেশের হাজী সাহেবানরা এখানে একত্রিত হতেন এবং তারা তাবলীগের এই মেহনতকে নিজের

চোখে দেখে নেয়ার সুযোগ পেতেন তাই তাদের মধ্যেও এক জযবা পয়দা হতো যাতে করে বিভিন্ন দেশে গমনকারীরা তাদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা লাভ করত। এতদ্সত্ত্বেও এই বরকতময় কাজ করতে গিয়ে জামা'আতের সাথীদেরকে অনেক মুজাহাদা করতে হতো। যেমন, পায়দল চলা, ছোলা বুট এবং খেজুর খেয়ে দিন কাটিয়ে দেয়া, ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্ট পাওয়া। কিন্তু এর সাথে সাথে প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সাহায্যও ছিল অকল্পনীয়। এভাবে সুদান, ইরাক, মিসর, সিরিয়া, জর্দান, ফিলিস্তিন, লেবানন, হাজরামওত, লিবিয়া, ইয়ামান, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো ইত্যাদি আরব রাষ্ট্রে তাবলীগের পরিচিতি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল।

আফ্রিকা :

আরব রাষ্ট্রসমূহে তাবলীগের কাজ জোরেশোরে শুরু হওয়ার পর আফ্রিকা এবং ইউরোপের দেশসমূহেও এর সূচনা হলো। সুতরাং আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, বার্মা, সিলন এবং আফ্রিকার দূর-দূরান্তের দেশগুলোতে তাবলীগি জামা'আত পৌঁছে গেল। ১৯৫৫ সালে সর্বপ্রথম জামা'আত গেল আফ্রিকায়। কেনিয়া, উগান্ডা, তাঞ্জানিয়া, জাম্বিয়া প্রভৃতি দেশে তাবলীগি কাজের পরিচয় তুলে ধরা হলো। এসব জামা'আতে গুজরাটের সাথী ভাইরা ছিল বেশি।

ইউরোপ :

এশিয়া এবং আফ্রিকার পরে দাওয়াতের কাজ ইউরোপের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সেখানকার দেশগুলোতে বস্তুবাদের জয়জয়কার। নতুন সভ্যতা (?) মানুষের আখলাককে রসাতলে নিয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহর বান্দারা সেখানেও আল্লাহ ও তার রাসূলের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। লন্ডন, ম্যানচেস্টার, বেডফোর্ড প্রভৃতি শহরে প্রচুর কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে। অনুরূপভাবে আমেরিকায় ওয়াশিংটন, বাফেলো, ডেট্রয়েট, ডারবান, শিকাগো, মেরিল্যান্ড, সানফ্রান্সিসকো, নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি শহরে তাবলীগের আওয়াজ জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে।

জাপান :

জাপানে তাবলীগের কাজের সূচনা ও গতিবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি অবদান যার তিনি হচ্ছেন জনাব আব্দুর রশীদ আরশাদ। তার একনিষ্ঠ মেহনতের ফলে জাপানের বৌদ্ধমন্দির গুলিতে ইসলামের আওয়াজ গুঞ্জরিত হয়েছে এবং অসংখ্য জাপানি ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছে। তাদের মধ্যে হাজী উমর মীতা, আব্দুল করীম সীতু এবং বোসানের নাম উল্লেখযোগ্য। তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বড়ই চমকপ্রদ ও শিক্ষণীয়। তাদের সেই ঘটনা পড়লে মনে হয় সত্যিই ইসলাম এক বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন ধর্ম। মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর যুগেই দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি নিজের সারাটি জীবন এই কাজের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন এবং স্বীয় জীবদ্দশাতে এর ফলাফল প্রত্যক্ষ করে গেছেন।

মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর শেষ হজ

হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.) ১৩৮৩ হিজরী মুতাবিক মার্চ ১৯৬৪ সালে হজের জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন। এটা ছিল তার শেষ হজ। এই সফরে শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) এবং তাবলীগের মুরব্বিদের একটি জামা'আত তার সাথে ছিল। মক্কা শরীফে পৌঁছে তিনি সকাল-সন্ধ্যা বয়ানের সিলসিলা শুরু করলেন। হারাম শরীফসহ বিভিন্ন ইজতিমায় তিনি একের পর এক বয়ান করতে থাকলেন এবং মদীনা শরীফেও এই সিলসিলা জারি থাকল। মাওলানার আহবানে সাড়া দিয়ে ২৬টি নগদ জামা'আত তৈরি হলো, যারা দীর্ঘ সফরে সময় দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। এর মধ্যে ১৮টি জামা'আত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হলো আর অবশিষ্ট ৮টি জামা'আত পাঠানো হলো বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে।

দ্বীনের জন্য মেহনত ও কুরবানী করার জযবা মাওলানার শিরায় শিরায় মিশে গিয়েছিল। শেষ হজের পরে এই জযবা আরো বৃদ্ধি পেল। প্রতিটি সফরে তিনি প্রতিদিন ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা বয়ান করতেন। নিযামুদ্দীনে অবস্থানকালীন সময়ে তার রুটিন দেখলে এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যেতে পারে। ফজরের নামায বেশির ভাগ সময় তিনি নিজেই পড়াতেন। নামাযের পরে দু'আ হতো। দু'আর পরে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা বয়ান করতেন। বয়ানের পরে তাশকীল হতো। এসব থেকে ফারেগ হয়ে নাশতা করতেন। নাশতায় শরীক বিশিষ্ট মেহমানদেরকে সেখানেই কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝাতে থাকতেন। বিভিন্ন ইজতিমার তারিখ নির্ধারণ করতেন এবং বিশেষ হিদায়াত দিয়ে মেহমানদেরকে বিদায় করতেন। ১১টার সময় জামা'আতগুলোর উদ্দেশ্যে হেদায়াতী বয়ান করে মুসাফাহার মাধ্যমে তাদেরকে বিদায় জানাতেন। এরপর বিশিষ্ট মেহমানদের সাথে দুপুরের খানা খেয়ে সামান্য সময় বিশ্রাম করে জোহরের নামাযে শরীক হতেন। জোহর থেকে আসর পর্যন্ত মুতালাআ এবং হাদীসের দরসদানে লিপ্ত থাকতেন। আছরের পরে চিঠিপত্রের উত্তর দিতেন। নবাগত মেহমানদের সাথে মুলাকাত করতেন। কখনো কখনো এ সময়েও বয়ান করতে হতো। মাগরিবের নামাযের পরে সুরায়ে ইয়াসীনের খতম হয়ে দু'আ হতো।

এশার নামাযের পরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের সীরাত থেকে আলোচনা হতো। হায়াতুস সাহাবা লিখিত হয়ে যাওয়ার পরে ধারাবাহিকভাবে সেখান থেকেই পড়ে শোনানো হতো।

মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর বয়ানের মধ্যে এমনই জাদুকরী প্রভাব ছিল যে, শ্রোতাদের ঈমান তাজা হয়ে যেত। যারা শ্রোতা হতেন তারা স্পষ্ট অনুভব করতেন যে, বয়ানে বসার আগে ঈমানের যে অবস্থা ছিল এখন তাতে অনেক তারাক্কী হয়েছে। কুরআন শরীফের মধ্যে যে ঈমান বৃদ্ধি হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা এখানে বসার পরে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যেত।

দাওয়াতী কাজে মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর একাগ্রতা

মাওলানা ইউসুফ সাহেবকে যারা কাছ থেকে দেখেছেন তারা খুব ভালো করেই জানেন যে, দাওয়াতী কাজের প্রতি মাওলানার একাগ্রতা, দায়বদ্ধতা কী পরিমাণ ছিল। জনৈক ব্যক্তি যিনি লাহোরে ফজরের নামাযের পরে মাওলানা ইউসুফ সাহেবের বয়ানে শরীক ছিলেন- তিনি বলেন, নামাযের পরে হযরত মাওলানা বয়ান শুরু করলেন এবং পুরো তিন ঘণ্টা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে বয়ান করলেন। এমন মনে হচ্ছিল যে, কোনো অগ্নিগিরি থেকে লাভার উদ্‌গীরণ হচ্ছে আর উপস্থিত লোকেরা তার তাপে বিগলিত হয়ে যাচ্ছে।

সাড়ে ৮টায় বয়ান শেষ হলে নাশতার জন্য দস্তরখানা বিছানো হলো। হযরত মাওলানা দস্তরখানায় বসার সাথে সাথে আবারও কথা শুরু করে দিলেন। কথার স্পিরিট, দলিলের শক্তি আর দাবির মজবুতী দেখে কারো জন্য এটা বোঝা কষ্টকর ছিল যে, এই ব্যক্তিই একটু আগে তিন ঘণ্টা তাকরীর করে এসেছেন। বরং মনে হচ্ছিল পরিপূর্ণ বিশ্রাম শেষে এইমাত্র তিনি কথা শুরু করেছেন। এটা ছিল নাশতার মজলিস। কিন্তু হযরত মাওলানা তার দাওয়াতী কাজের ব্যাখ্যায় এতই ডুবে ছিলেন যে, নাশতার প্রতি তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। একজন চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে দিলে তিনি ধরলেন ঠিকই, কিন্তু ১০-১৫ মিনিট ওভাবেই ধরে রাখলেন, চুমুক দেয়ার সুযোগ হলো না। তারপরে অন্য আরেকজনের মনে করিয়ে দেয়ায় তিনি শরবত হয়ে যাওয়া সেই চা পান করলেন। দ্বিতীয় আরেক কাপ এই বলে পেশ করা হলো যে, হযরত এটা গরম আছে, পান করে নিন। সাথে বিস্কুটও দেয়া হলো। কিন্তু আল্লাহর বান্দা সেই কাপের সাথেও একই ব্যবহার করলেন। কথাবার্তায় ডুবে গেলেন আর ১০-১৫ মিনিট পরে ঠাণ্ডা শরবতের মতো পান করলেন। এর পরে অন্য আরেকটি ইজতিমায় বয়ান করার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন। অথচ এটাও জানা ছিল যে, দুপুর ২টার আগে তৃতীয় আরেকটি ইজতিমায় বয়ান করতে হবে। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং তার জীবনের প্রতিটি দিনই ছিল এ রকম ব্যস্তময়।

হযরত মাওলানার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেন, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো, তিনি বয়ান শুরু করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার প্রতি রুজু করতেন, মুরাকাবা করতেন অতঃপর বয়ান শুরু করতেন। এর পরে তার নিজের আর হুঁশ থাকত না। কয়েক বছর আগের ঘটনা, ভূপালে ইজতিমা ছিল, তখন হযরত মাওলানার রানে বহুত বড় একটা ক্ষত ছিল, নড়াচড়া করলে কিংবা জোরে কথা বললে সেখান থেকে রক্ত ঝরা শুরু হতো। মাওলানা এই অবস্থাতেই ভূপাল তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী ইজতিমায় দীর্ঘ সময় বয়ান করলেন, যার ফলে তার ব্যথা অনেক বেড়ে গেল। ভূপালের পরে সেখান থেকে ৫০ কি.মি.দূরে আরেকটি ইজতিমার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। হযরত মাওলানা সেখানেও তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তবে সিদ্ধান্ত হলো, হযরত মাওলানা সেখানে বয়ান করবেন না বরং সাথীরা বয়ান করবে। কিন্তু সাথীরা বয়ান করার পরে মাওলানার মনে হতে লাগল দাওয়াতের কথা ঠিকমতো উপস্থাপন করা হয়নি। তাই তিনি নিজেই বয়ান করতে চাইলেন, অথচ শারীরিক অবস্থা এই ছিল যে, বসতে পারছিলেন না। সুতরাং শুয়ে শুয়ে বয়ান শুরু করলেন। অপরদিকে ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হলো। সেখানে একটি কাপড় রেখে দেয়া হতো, অল্পক্ষণের মধ্যে সেটি রক্তে ভিজে গেলে আরেকটি রাখা হতো। এভাবে কয়েকটি কাপড় পরিবর্তন করতে হলো। হযরত মাওলানা স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী এখানেও দীর্ঘক্ষণ বয়ান করলেন। অনুমান করা হচ্ছিল যে, এই সময় তার শরীর থেকে প্রায় আধা কেজি রক্ত বের হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার কোনো হুঁশই ছিল না যে, কী হচ্ছে।

পরিবারের লোকজন বিশেষ করে স্ত্রীকে সকলেই কমবেশি সময় দিয়ে থাকে, তার খোঁজখবর নিয়ে থাকে। কিন্তু হযরত মাওলানা স্বীয় বেগম সাহেবার সে রকম খোঁজখবর নিতে পারতেন না, তার স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন এবং শেষ দিকে এসে অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থা দেখে জনৈক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তার নিকট পাঠাল এবং তাকে বলে দিল তোমরা তার পুরোপুরি খোঁজখবর নিয়ে তার সাথে

এমনভাবে কথা বলবে যেন সে তার কষ্টের কথা তোমার কাছে খুলে বলে। তার দিলের ব্যথা যেন তার কথায় প্রকাশ পায়। এতে বোঝা যাবে হযরত মাওলানার প্রতি তার কোনো অভিযোগ আছে কি না? নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত মহিলা তার নিকট গিয়ে এসব কথা তুলে ধরলে তিনি স্বামীর পক্ষে সাফাই গেয়ে বললেন, তিনি তো দিন-রাত দ্বীনের ফিকির এবং দ্বীনের কাজে লেগে থাকেন, তার তো নিজেরই হুঁশ থাকে না, আমি নিজেই তাকে বলে দিয়েছি যে, আমার ব্যাপারে আপনাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না। চিকিৎসা চলছে। আল্লাহ তা'আলা যদি জান্নাতে একত্রে থাকার সুযোগ করে দেন তাহলে সেখানে আরামে থাকা যাবে। কয়েক মাস পরে এই রোগেই নামাযের মধ্যে সিজদারত অবস্থায় তার ইন্তিকাল হয়ে যায়।

মাওলানা ইউসুফ (রহ.) তাবলীগের পাবলিসিটি পছন্দ করতেন না

হযরত মাওলানা সাধারণভাবে তাবলীগি কর্মকাণ্ডের প্রচার প্রপাগাণ্ডা অপছন্দ করতেন। একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, এই কাজের ব্যাপকতার জন্য প্রচলিত প্রথা যথা, পত্রপত্রিকা, লিফলেট, পোস্টার, ব্যানার, মাইকিং ইত্যাদি থেকে পরহেয করা জরুরি। এই কাজ তো প্রচলিত প্রথাবিরোধী। এই কাজ তো প্রসার লাভ করবে দাওয়াত, গাশত, তালীম, তাশকীল ইত্যাদি দ্বারা।

প্রচারমাধ্যমকে তিনি এতটাই এড়িয়ে চলতেন যে, তার মৃত্যুর পরে জনৈক ব্যক্তি তার চিঠিপত্রের খোঁজে নিযামুদ্দীন সফর করল যাতে সেগুলো ছাপানো যায়, কিন্তু সেখানে একটা চিঠিও পাওয়া গেল না। অথচ তিনি প্রচুর পরিমাণে চিঠিপত্র লিখতেন।

সকলের প্রিয়পাত্র মাওলানা ইউসুফ (রহ.)

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব (রহ.) আল্লাহর জন্য এবং তার দ্বীনের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ ফানা করে দিয়েছিলেন। নিজের সর্বশক্তি এবং সর্বস্ব আল্লাহর রাস্তায় এমনভাবে লাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিজের ব্যক্তিগত বলে কিছু ছিল না। আল্লাহ তা'আলা নিজের লাখো বান্দাকে তার জন্য লাগিয়ে দিয়েছিলেন, যারা মাওলানার সামান্য ইশারায় তার জন্য লক্ষ-কোটি টাকা খরচ করতে, এমনকি জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। এমনটা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, বড় বড় রাজা-বাদশা, মন্ত্রী-মিনিষ্টারও স্বীয় প্রজাদের দিলে অতটুকু জায়গা করতে পারেননি, যতটুকু পেরেছিলেন মাওলানা ইউসুফ (রহ.)। তিনি কোনো পার্টি বানাননি, নিজের কাজের প্রচারের জন্য কোন মিডিয়া, পত্রপত্রিকা, লেটারেচারের সাহায্য নেননি বরং এগুলোকে সাধ্যমতো এড়িয়ে চলতেন।

তিনি কখনো কোনো ফান্ড জমা করেননি। নিজেও কুরবানী দিয়েছেন অন্যদেরকে কুরবানী করার জন্য আহ্বান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হাজারো-লাখো বান্দাকে তার পাশে জমা করে দিয়েছেন। মুসলমানদের মাঝে ইসলামের দৈন্যদশার মুহূর্তেও আসমান-যমীন দেখে নিয়েছে যে, চাটাইয়ের ওপর বসা এক দরবেশ আলেম ও দ্বীনের দাঈর আহ্বান ও মেহনতে আল্লাহ তা'আলার লাখ লাখ বান্দা ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা থেকে, শহর-বন্দর, গ্রামগঞ্জ থেকে ছুটে এসে পৃথিবীর কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়েছে। আরবি, উর্দু, ফার্সি, তুর্কি, বাংলা-ইংরেজি, পাঞ্জাবি-হিন্দি সব ভাষার লোক সেখানে এক কাতারে শামিল হয়ে গেছে।

ইন্তিকালের পূর্বে পাকিস্তানে কয়েক দিন

পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় কিছুদিন অবস্থান করার পরে ১২ই এপ্রিল রোজ শুক্রবার ট্রেনে করে লাহোর থেকে সাহারানপুর রওয়ানা হওয়ার প্রোগ্রাম ছিল হযরত মাওলানার। বৃহস্পতিবারে রাইব্যান্ডের প্রোগ্রাম শেষ করে তিনি লাহোর চলে গেলেন। অবশ্য এর আগের দিন গলা থেকে পেট পর্যন্ত খাদ্যনালিতে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন। লাহোরে গিয়ে বয়ান করার মতো কোনো আগ্রহ ছিল না, এটা ছিল হযরত মাওলানার জন্য অকল্পনীয় এক জিনিস, এটা তিনি ব্যক্তও করে দিয়েছিলেন। লাহোরের তাবলীগি মারকায বেলাল পার্কের মসজিদে বৃহস্পতিবারের মাগরিবের নামায শেষে সাপ্তাহিক ইজতিমা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সকলেই জানতেন আগামী কাল মাওলানা হিন্দুস্তান চলে যাবেন, পাকিস্তানে আজই তার শেষ দিন। তাই সকলেরই খেয়াল ছিল আজকের ইজতিমায় হযরতজীই বয়ান করবেন। সুতরাং অন্যবারের তুলনায় আজকের লোকসমাগমও ছিল প্রচুর। আবার এমন কিছু লোকও সেদিন এসেছিল যারা সাধারণত তাবলীগ থেকে দূরে থাকে। তাই কিছু বন্ধুবান্ধব হযরতকে বয়ান করার অনুরোধ করলে তিনি কিছু বলার এরাদা করলেন। অত্যন্ত দুর্বলতা আর অসুস্থতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ঈমানী আর রূহানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে প্রায় সোয়া ঘণ্টা বয়ান করলেন। কথা শুনে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি মনের সাথে যুদ্ধ করেই কথা বলছেন। কপাল থেকে ঘাম ঝরছিল। আওয়াজে দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছিল।

বয়ানের পরে তাশকীল শুরু হলো। তখনও তিনি কষ্ট করে চেয়ারে বসা। তাশকীল শেষে একটা বিবাহ পড়ালেন।

কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না, সংক্ষিপ্ত দু'আ করলেন। যা জীবনের একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল। তাই ঘনিষ্ঠজনরাও উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে, বিশেষ কোনো অসুবিধা হচ্ছে। বিবাহের মজলিস থেকে উঠে থাকার জায়গার দিকে পা বাড়ালেন, যা একেবারেই সামনে ছিল। চলতে চলতে বললেন, আমাকে ধর। জনাব সাঈদ ইবনে সিদ্দীক এবং রিয়াজ লাহোরী সাথে সাথে গলা এবং কোমর ধরে ফেললেন, কয়েক কদম অগ্রসর হতে না হতেই বেতাল হয়ে গেলেন এবং বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন, ধরাধরি করে কামরায় নিয়ে শুইয়ে দেয়া হলো।

সফর সঙ্গীদের মধ্যে একজন হাকীম সাহেব ছিলেন। তিনি দুধের সাথে কিছু ওষুধ মিশ্রিত করে পান করালে সামান্য একটু হুঁশ এল। হাত-পা একেবারেই ঠাণ্ডা ছিল। শ্বাস-প্রশ্বাস ছিল ক্ষীণ। লাহোরের খ্যাতনামা ডাক্তার কর্নেল জিয়াউল্লাহ সাহেবকে সংবাদ দেয়া হলো। তিনি দেখে বললেন, হার্টে এমন কঠিন অ্যাটাক হয়েছিল যে, তা থেকে বেঁচে যাওয়া কারামতই বলতে হবে। তিনি তখনই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না তবে ডাক্তারের নির্দেশিত ওষুধ-পথ্য চলতে লাগল। অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পরে হযরত মাওলানা ইশার নামায আদায় করলেন। সকাল পর্যন্ত এতটাই সুস্থ হয়ে গেলেন যে, সকালে কর্নেল জিয়াউল্লাহ সাহেব এসে দেখে বিস্ময়ে থ হয়ে গেলেন। উপস্থিত সকলে মোটামুটি আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। এই সময়ে হযরতজী কিছু জরুরি কথাও বললেন। মাওলানা এনামুল হাসান সাহেবকে বললেন, আমার কিতাবগুলোর যেন যাকাত আদায় করে দেয়া হয়। মোটকথা, দুপুর পর্যন্ত তবীয়ত খুব ভালোই ছিল। কিন্তু জুমার সময় শরীর আবার হঠাৎ করেই বিগড়ে গেল। শ্বাস আটকে যেতে লাগল। বললেন আমাকে সংক্ষেপে নামায পড়িয়ে দাও। মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব সংক্ষিপ্ত নামায পড়িয়ে দিলেন। ওদিকে মসজিদে জুমু'আর নামাযও মুফতী যাইনুল আবেদীন সাহেব সংক্ষিপ্ত করলেন। ডাক্তার আসলাম সাহেব এসে দেখে বললেন, আবার রোগের হামলা হয়েছে। এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। যাতে করে অক্সিজেন দেওয়া যায়। হযরত মাওলানা এ কথা শুনে বললেন, সেখানে তো নার্সরাও থাকে। মুফতী যাইনুল আবেদীন সাহেব বললেন, কোনো মহিলা এবং নার্স যেন কাছে না আসে তার পুরাপুরী ব্যবস্থা করা হবে। এ কথা শুনে মাওলানা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

শেষ মুহূর্তে

হযরত মাওলানাকে গাড়িতে শুইয়ে দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সাথে বসলেন মাওলানা এনামুল হাসান, মৌলবী ইলিয়াস মেওয়াতী এবং ডাক্তার আসলাম সাহেব। তখন শ্বাস-প্রশ্বাস আরো আটকে যাচ্ছিল। আর মাওলানার মুখে তখন রাব্বিয়াল্লাহ, রাব্বিয়াল্লাহ যিকির জারি ছিল। মৌলবী ইলিয়াস বলেন, হযরতজী এই যিকিরের সাথে সাথে সন্ধ্যায় যেসব দু'আয়ে মাসুরা পড়া হয় সেগুলো পড়তে শুরু করলেন এবং কালেমাও পড়তে থাকলেন। পথিমধ্যে মাওলানা জিজ্ঞাসা করলেন হাসপাতাল আর কতদূর? বলা হলো এখনও অর্ধেক পথ বাকি। এরপরে মুখ থেকে স্পষ্টভাবে আর কোনো কথা বের হচ্ছিল না। চোখেও পরিবর্তন দেখা দিল। মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত শুরু করলেন। তেলাওয়াতের মধ্যেই হযরত মাওলানা কালেমা শরীফ পড়তে পড়তে সহাস্য বদনে, প্রফুলচিত্তে পরপারের পথে পাড়ি জমালেন। তারিখ ছিল ১৩৮৪ হিজরীর ২৯ শে যিলকদ মুতাবিক ১২ই এপ্রিল ১৯৬৫ সাল, রোজ শুক্রবার দুপুর ২টা।

মাওলানা ইউসুফ সাহেবের কতিপয় বাণী

☆ মাওলানা ইউসুফ (রহ.) বলতেন, ইসলাম যখন চমকেছে তখন কুরবানীর দ্বারাই চমকেছে। আজও চমকাবে যদি তার জন্য কুরবানী দেয়া হয়। ইসলামের জন্য যদি কুরবানী হয় তাহলে চতুর্দিকে দুশমন থাকলেও ইসলাম চমকাবে। আর যদি কুরবানী না দেয়া হয় তাহলে বাদশাহী থাকলেও তা মিটে যাবে।

☆ তিনি বলেন, মানুষ যদি ইসলামের জন্য এতটুকু সময় বের করে মেহনত করে যাতে তার কাজকর্মে কোনো প্রভাব পড়বে না, কাজের কোনো ক্ষতি হবে না তাহলে এই মেহনত দ্বারা ঈমান ও একীন পয়দা হবে না। চাই লাখো মানুষ এজন্য মেহনত করুক।

☆ তিনি আরো বলতেন, লোকজন যখন নিজেদের খানাপিনা আর আরাম-আয়েশে লিপ্ত থাকবে এবং ইসলামের জন্য স্লোগান দেবে তো এর দ্বারা ইসলাম যিন্দা হবে না, ইসলাম তো তখনই যিন্দা হবে, যখন তার জন্য জানমালের বাজি লাগিয়ে দেয়া হবে।

☆ মাওলানা ইউসুফ সাহেব বলতেন, তাবলীগের উদ্দেশ্য অন্যের সংশোধন না বরং নিজের সংশোধন করা উদ্দেশ্য। সহীহ যিন্দেগী সেটা, যেটা নিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছিলেন। আমরা সেই যিন্দেগীর ওপর উঠে যাই।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকায় অনুষ্ঠিত "লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়" শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাকিব ফয়জাবাদী কাসেমী সাহেবের যুগান্তকারী তাকরীর

লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-২

অতীতে সৃষ্ট কিছু দলের ইতিহাস :

বন্ধুরা! অতীতে নতুন নতুন যত দল সৃষ্টি হয়েছিল, সবার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমাদের জানা থাকা উচিত। কেননা, এসব ভ্রান্ত দলের গোড়াপত্তন হয় সাহাবা এবং তাবেঈনের স্বর্ণালি যুগে। তারা ওই সব ভ্রান্তদলের প্রতিরোধ যেভাবে করেছিলেন, আমাদেরকেও ঠিক সেই পথেই অগ্রসর হতে হবে। আর এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, তাদের প্রতিরোধমূলক ওই সব কর্মকাণ্ড অবশ্যই সংস্কারমূলক। এখন আমাদের এই সব কর্মকাণ্ডকে কেউ যদি মতবিরোধ সৃষ্টিকারী কাজ বলে অপপ্রচার চালায়, তাদের কলঙ্কের এই তিলক আমাদের ওপর যেমন পড়বে আল্লাহ মাফ করুন সাহাবায়ে কেরামের ওপরও পড়বে কি না ভেবে দেখতে হবে। অথচ ইতিহাস দরাজ কণ্ঠে এই কথা ঘোষণা করছে, ইসলামের জন্য সবচেয়ে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র জামা'আত। এরপর সৃষ্টি হয় কিছু অধুনা ফিতনা। কাদিয়ানী ফিতনা, মাহদবী ফিতনা। কাদিয়ানী ফিতনার প্রভাব আপনাদের দেশে সম্ভবত কম। যদি বেশি হয়ে থাকে, তাহলে তাদের আদ্যোপান্ত আপনাদের জানা থাকার কথা।

বন্ধুরা! মাহদবী ফিতনার সম্পর্ক হিন্দুস্তানের জৈনপুর এলাকার সাথে। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, যেখানে কোনো ফিরকার উদ্ভব হয়, তাদের সম্পর্কে সেখানকার উলামায়ে কেরামের মন্তব্যই সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। যখন মুহাম্মদ মাহদী জৈনপুরী নিজেকে মাহদী বলে দাবি করে, তখন সে ঘটনাক্রমে আফগানিস্তান সফর করে। আফগানিস্তানের তৎকালীন গভর্নর স্থানীয় আলেমদেরকে তার সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য একত্রিত করলেন। আফগানিস্তানের আলেমদের জন্য এই ফিতনা ছিল একেবারে নতুন। তাই তারা তার সাথে বিতর্কে জয়ী হতে পারেননি। তখন একজন পরামর্শ দিল, এই ফিতনা যেখানে গজিয়ে উঠেছে, সেখানকার উলামায়ে কেরামের অভিমত জানা দরকার। পরে সিদ্ধান্ত হলো মুহাম্মদ মাহদী জৈনপুরীর সাথে মুক্ত আলোচনার জন্য হিন্দুস্তানের জৈনপুর থেকে কিছু আলেমকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জৈনপুর থেকে কিছু আলেমের আফগানিস্তান আগমনের সংবাদ যখন মাহদী জৈনপুরী জানতে পারল, তখন সে নিজের ইজ্জত-সম্মান বাঁচিয়ে তা ভালোই ভালোই আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু পথিমধ্যেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। সে তাদের সাথে কথা বলার ঝুঁকি গ্রহণ করেনি। এটি এই দলের কোনো বৈশিষ্ট্য নয়, বরং ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যে ফিতনা যেখানে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, সেখানকার উলামায়ে কেরাম তাদের ভ্রান্তি সম্পর্কে অধিক সচেতন এবং ওয়াকিবহাল থাকেন। তারা ওই সব আলেমের সাথে কথা বলতে মোটেও প্রস্তুত হয় না, যারা তাদের পেছনের ইতিহাস, প্রেক্ষাপট এবং তাদের নাড়ি-নক্ষত্রের খবরাখবর সম্পর্কে সম্যক অবগত। তারা ওই সব লোকের সামনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বড়ত্ব জাহির করতে চায়, যারা তাদের সম্পর্কে ভাসা-ভাসা নয়, বরং এর চেয়ে ও কম জ্ঞান রাখেন।

বন্ধুরা! আজকে যে লা-মাযহাবী ফিতনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা সমবেত হয়েছি, দুর্ভাগ্যজনক হলেও ইতিহাসের নির্মম ট্র্যাজেডি যে, ওই ফিতনার গোড়াপত্তন হয় আমাদেরই দেশে। তথা উপমহাদেশে।

তথাকথিত আহলে হাদীস প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট :

আব্দুল হক বেনারসী নামে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর সৈন্যদলে একজন লোক ছিল। আব্দুল হক বেনারসী কাজী শাওকানীর শিষ্য ছিল। নায়লুল আওতারসহ অসংখ্য গ্রন্থ প্রণেতা কাজী শাওকানীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আব্দুল হক বেনারসী। কিন্তু তলে তলে সে ছিল শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী। সে সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর ঈমানী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শাহ ইসহাকসহ অনেক আলেম তাকে অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখতেন। আপনারা তখনকার পরিস্থিতি অনুধাবন করতে চেষ্টা করুন। যখন শাহ ইসহাক (রহ.) এ পৃথিবী ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান, তখন হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় দুটি বিপরীতমুখী দর্শনের প্রতি মানুষ ঝুঁকে পড়ে। শায়খুল কুলফিল কুল মিয়া নজীর হুসাইন দেহলভী শাহ ইসহাক (রহ.)-এর শিষ্য। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যাহেরিয়্যাত তথা বাহ্যত অবস্থার ওপর। অর্থাৎ হাদীস থেকে বাহ্যত যা প্রতীয়মান হয় তাই তার কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে

বিবেচিত হতো। গাইরে মুকাল্লিদদের অনেক মাসআলার গোড়াপত্তন তিনিই করেন, তিনি সেই মাদরাসায় পাঠদান করতেন। তার ছাত্রদের দীর্ঘ তালিকা তারীখে আহলে হাদীস নামক বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তার ছাত্র ছিল মাওলানা বারকাত আহমদ সাহেব, তার ছাত্র ছিল মাওলানা মুনাজির আহসান গীলানী এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরাম। উলামায়ে দেওবন্দের হাদীস শরীফের যে ধারাপরম্পর, তা মিয়া নজীর হুসাইনের মধ্যস্থতায় নয়, বরং শাহ ইসহাক (রহ.)-এর সূত্রে শাহ আব্দুল গণী (রহ.)-এর মাধ্যমে চলে এসেছে। রাজস্থানে আমার এক শায়খ আছেন, মাওলানা মুফতী আহমদ হাসান সাহেব দা.বা., শতোর্ধ্ব বয়স্ক এই মহান বুজুর্গ মাওলানা বারকাত আহমদ (রহ.)-এর সরাসরি ছাত্র। মোটকথা, মিয়া নজীর হুসাইন হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ওপর গুরুত্বারোপ করতেন এবং তদনুযায়ী আমল করার প্রবক্তা ছিলেন। একদিকে আব্দুল হক বেনারসী, মিয়া নজীর হুসাইন দেহলভী এবং এর কিছুদিন পর আওলাদ হাসানের ছেলে সিদ্দিক হুসাইন সাহেব, তার ছেলে হচ্ছে নুরুল হাসান সাহেব, তিনি ভূপালের অধিপতি ছিলেন। তাদের সবার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, হাদীসের বাহ্যিক অবস্থার ওপরই আমল করা হবে। তারা ইসলামের এক নতুন সংস্করণ বের করতে প্রয়াসী ছিলেন, যেখানে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী নামের কোনো বিভেদের প্রাচীর থাকবে না। তাদেরই হাত ধরে লা-মাযহাবী নামের নতুন ফিতনার উন্মেষ ঘটে। এরপর সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন, মাওলানা সানাউল্লাহ আমরতছরী এবং মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী, সকলের আপ্রাণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে নবোদ্ভাসিত এই দলের নাম আহলে হাদীস বরাদ্দ করতে সক্ষম হয়। এই ভ্রান্তদল সর্বপ্রথম নিজেদেরকে তায়েফা মানছুরা, এরপর আছরী, অতঃপর ইংরেজ আদালত কর্তৃক আহলে হাদীস নামটি তাদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়। সম্প্রতি তারা নিজেদেরকে সালাফী বলতেও শোনা যায়। ভবিষ্যতে যে আরো কত নামের ম্যাজিক দেখা যাবে, আল্লাহ মালুম! এদের নাম পরিবর্তন হতেই থাকবে। আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে, তারা নির্দিষ্ট কিছু মাসআলাকে নিজেদের বিচরণক্ষেত্র নির্ধারণ করেছে, এর পূর্বে কিন্তু এই ধরনের কোনো দর্শন কিংবা কোনো মতভেদ ছিল না। আমি প্রায় সময় বলে থাকি, কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে চৌদ্দশত বছর পূর্বে। কিন্তু লা-মাযহাবীদের সর্বপ্রথম মুফাসসির হলেন মুহাম্মদ জোনগরী। তার কুরআনের অনুবাদ হিন্দুস্তানেও পাওয়া যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে সৌদি আরব থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দুর্বোধ্য ছিল।

একইভাবে হাদীস শরীফ। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনদের অপরিমেয় সেবা ইতিহাসের এক স্বর্ণালি অধ্যায়। হাদীসের বিশুদ্ধ ছয় গ্রন্থ তথা সিহাহ সিত্তা হাদীসের অনবদ্য ইনসাইক্লোপিডিয়া। কিন্তু তাদের প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কাজ আঞ্জাম দেন ওয়াহীদুজ্জামান খান হায়দারাবাদী। এর পূর্বে হাদীসের জগতে তাদের কোনো গ্রন্থই খুঁজে পাওয়া যায় না। ওয়াহীদুজ্জামানের গ্রন্থের ওপর লা-মাযহাবীদের অগাধ আস্থা এবং বিশ্বাস। নতুন নতুন কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন দাউদরাজ। একইভাবে দ্বীনের মাসআলার অস্তিত্বও ওইদিন থেকে সূচনা হয়েছে যেদিন থেকে এই উম্মাহর সূচনা হয়েছে। একইভাবে মতবিরোধের সূচনাও তখন থেকে। স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) অনেক মাসআলায় মতবিরোধ করেছেন। কিন্তু তাদের ফেকাহর গ্রন্থ সর্বপ্রথম সিদ্দিক হাসান সাহেব রচনা করেছেন। এরপর তার পুত্র নুরুল হাসান সাহেব রচনা করেছেন। এর পূর্বে তাদের কোনো ফেকাহর গ্রন্থ ছিল না।

আব্দুল হক ও শিয়া মতাদর্শ :

আব্দুল হক বেনারসী যে শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল, এ কথা অকপটে স্বীকার করেছেন তারই সহপাঠী কারী আব্দুর রহমান পানিপথি। তিনিও শাহ ইসহাক (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন। আমি বলছিলাম, সমস্ত ভ্রান্ত সম্প্রদায় আদাজল খেয়ে লেগেছে সত্যপন্থী আলেমদের বিরুদ্ধে। এমতাবস্থায় সত্যপন্থী আলেমরা যদি রণাঙ্গনে নেমে তাদের দাঁতভাঙা জবাব না দিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন, তাহলে পুরো উম্মতের জন্য এর পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়ানক।

একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ :

আমি প্রায়ই একটি উদাহরণ দিয়ে থাকি। মহান আল্লাহ গোশতকে বাঘের জন্য রিযিক নির্ধারণ করেছেন। বাঘ শুধু গোশতই খেতে পারে, সে ভূসি-তৃণলতা খেতে পারে না। অন্যদিকে ছাগলের মালিককেও তার ছাগল সংরক্ষণের পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন। এখন কেউ যদি বাঘের সামনে কারো ছাগল এগিয়ে দেয়, তা কি আইনসম্মত হবে? একইভাবে আমাদের দেশে যদিও গণতান্ত্রিক ধারা প্রচলিত। যে কেউ নিজের চিন্তা মতামত নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করতে পারে। কিন্তু এই অধিকারের ব্যাপ্তি কতটুকু? যতক্ষণ তার হাত তার পকেটে ঢুকবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে কেউ যদি আমার পকেটে হাত দিতে চায়, আমি কি বসে থাকব? তাহলে কথা কী দাঁড়াল? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে যে কেউ যেকোনো মতাদর্শ প্রচার করতে পারে। কিন্তু সত্যপন্থী আলেমরা হচ্ছেন এ অঞ্চল তথা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর

সামগ্রিক বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। দ্বীনের যেকোনো ক্ষেত্রে সামান্যতম ত্রুটি হলেও গর্জে উঠতে হবে তাদেরই। যেকোনো ভ্রান্ত মতাদর্শ যত মনোহরী আকৃতিতেই আসুক না কেন, খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে দিতে হবে ঈমানী চেতনার কূলকিনারাহীন কহর দরিয়াতে। কেউ যদি আমাদের সমাজ থেকে বের হয়ে কিছু করতে চায়, তাহলে সে জানে আর তার প্রভু জানে। কিন্তু সে যদি আমাদের মতাদর্শের লোকের আক্বীদা বিশ্বাসে চিড় ধরাতে চায়, আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত ঈমানী চেতনাকে টার্গেট করতে চায় তাকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়া আত্মহনন বৈ কিছু নয়। যাদের ধমনীতে সামান্যতমও শ্লাঘা আছে নিদেনপক্ষে এটা তাদের জন্য একেবারে অসম্ভব।

লা-মাযহাবীদেরকে একটি প্রশ্ন :

কোনো লা-মাযহাবীর সাথে আপনার যদি ঘনিষ্ঠতা থাকে, তাকে আপনি আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করুন, তুমি লা-মাযহাবী ফিতনার মায়াজালে জড়ানোর পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে তোমার চিন্তা-চেতনা কী ধরনের ছিল? তুমি কত ভদ্র, শিষ্ট এবং মার্জিত ছিলে? এই ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার পর তোমার বিশ্বাসও নড়বড়ে হয়ে গেছে এবং শিষ্টাচার থেকে যোজন-যোজন দূরত্বে তুমি ছিটকে পড়েছো। মানুষের রোগব্যাধি কিছু আলামত থেকে চিহ্নিত করা যায়। অন্তরের ব্যাধি হচ্ছে বিশ্বাস টলমলে হয়ে যাওয়া। বাহ্যিক ব্যাধি হচ্ছে অশিষ্টতা এবং অভদ্রতা। তাদের রোগ এভাবে ধরা পড়ে যে, যারা উচ্চস্বরে আমীন বলে, রফঈ ইয়াদাইন করে, সীনার ওপর হাত বাঁধে, মাথায় টুপি রাখে না, এ সবই হচ্ছে এ কথার পরিচায়ক যে, তার অন্তঃকরণে বিভিন্ন ধরনের ঈমানবিধ্বংসী জীবাণু কিলবিল করছে, শত চেষ্টার পরও যাকে সে ধামাচাপা দিতে সক্ষম হচ্ছে না।

ইসলামের এক সর্বসম্মত নীতি :

ইসলাম ধর্মে এ কথা অত্যন্ত জোর দিয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেকের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতে হবে। কোনো নির্ভরযোগ্য শরয়ী দলিল-প্রমাণ ছাড়া কারো সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা যাবে না। তথাপি যদি কারো কোনো ভুল-ত্রুটি সামনে পড়েই যায়, তাকেও সাধ্যমতো সঠিক ব্যাখ্যার প্রয়াস চালাতে হবে। এ বিধানটি সাধারণ মুসলমান সম্পর্কে। এখন সাহাবায়ে কেরাম, যারা ইসলাম ধর্মের প্রথম সাক্ষী এবং সাত্ত্বিক অনুসারী, ইসলাম ধর্মের অবিস্মরণীয় প্রচার-প্রসারে যাদের অপরিসীম আত্মত্যাগের স্বীকৃতি এসেছে প্রায় শত্রু-মিত্র সবার কাছ থেকে, তারা কি আমাদের কাছে এতটুকু অধিকার চাইতে পারেন না যে, আমরা তাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করব? তাদের সম্মানের সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত করব? এখন চিন্তা করে দেখুন, তাদের পরিণতি কী হবে, যাদের অন্তরে সাহাবায়ে কেরামের ভক্তি-মাহাত্ম্যের লেশমাত্রও অবশিষ্ট নেই। শুধু তা-ই নয়, বরং তাদের অন্তরে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে রীতিমত শত্রুতা এবং হিংসা রয়েছে। অথচ সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করা, এটি কুরআনের অনেক আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

ইতিহাস থেকে কি আকীদা প্রমাণিত হয়?

এখানে আরেকটি বিষয় সম্পর্কে আমি সামান্য আলোকপাত করার প্রয়াস পাব। তা হচ্ছে, ইতিহাসের বর্ণনা আর আক্বীদাসংক্রান্ত। ইতিহাস হচ্ছে অনুমাননির্ভর কিছু বর্ণনার সমষ্টি। আন্দাযে ঢিল ছোড়ার মতো। অব্যর্থ নিশানাকে যেমন টার্গেট করতে পারে, তেমনি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। বরং অধিকাংশ সময় তাই হয়। অথচ আক্বীদা প্রমাণিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন অকাট্য প্রমাণ, যাতে থাকবে না সন্দেহ-সংশয়ের সামান্যতম লেশমাত্রও। ইতিহাসের অনেক গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সম্পর্কে অনেক ধরনের বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে, যেমন, হযরত উমর (রা.) কর্তৃক হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)-কে সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করা সম্পর্কে। হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা.) কর্তৃক নিজের পুত্রের জন্য বাইআতের ঘোষণা করা, হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) কর্তৃক মাসআলায়ে তাহকীমের (তথা পবিত্র কুরআনকে বিচারক মেনে নেয়া) ওপর সন্তুষ্ট হতে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা, হযরত উসমান (রা.) স্বীয় নিকটবর্তী আত্মীয়দেরকে ইসলামী সাম্রাজ্যের গভর্নর নিযুক্ত করা, হযরত আলী (রা.) ইসলামী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সিফফীন এবং উষ্ট্রীযুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং অসংখ্য সাহাবায়ে কেরামের ঘটনা, যা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। খুবই আশ্চর্য লাগে, যখন দেখি অনেক আলেমও এসব পড়ে ধোঁকায় পড়ে যান। অথচ আমরা অহর্নিশি পড়ে আসছি, ইতিহাসের আদ্যোপান্ত নির্ভর করে অনুমানের ওপর। ইতিহাস রচিত হয় কিভাবে? কারো যবানি শুনে, কোন ভূখণ্ড অবলোকন করে, পুরাতন কিছু নিদর্শন অবলম্বন করে অথবা কোনো দুর্বোধ্য পাণ্ডুলিপির সাহায্যেই রচিত হয় ইতিহাস। যেসব ভিতের ওপর ইতিহাস নামক সুরম্য অট্টালিকা দাঁড়িয়ে আছে, তার একটিও অকাট্য তো নয়, বরং এর ধারেকাছেও নয়। ইতিহাস সম্পূর্ণ অনুমাননির্ভর, যা কস্মিনকালেও ইয়াকীনের স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। অথচ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সম্পর্কে সুধারণা রাখার প্রতি নির্দেশ প্রদানকারী যেসব বর্ণনা তার আগাগোড়াই অকাট্য, তা প্রমাণিত হয় পবিত্র কুরআনের

কোনো আয়াত থেকে, হাদীস শরীফেও তার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। সাহাবীদের পারস্পরিক ব্যবহার তার অন্যতম বনেদি ভিত্তি, তাবেঈদের সর্বসম্মত এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে الصحابة كلهم عدول (প্রত্যেক সাহাবী নির্ভরযোগ্য) ও এর স্বপক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতগুলো অকাট্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ইতিহাসের কিছু অনির্ভরযোগ্য বর্ণনার ধুনকো ও অসার অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা, তা প্রচার-প্রসারের নিমিত্তে স্বতন্ত্র মিশন নিয়ে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা আবার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সাত্ত্বিক অনুসারীদের আলেখ্যকে জনসাধারণের সামনে বিভেদ সৃষ্টিকারী হিসেবে উপস্থাপন করা, বন্ধুরা! এসব ধূর্ত ও ধড়িবাজ ইহুদি-খ্রিস্টানের চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ নয় কি? কোনো নামধারী মুসলমানও কি এ ধরনের দুঃসাহস দেখানোর স্পর্ধা দেখাবে? ইতিহাসে তো ইহুদি-খ্রিস্টানের বর্ণনা ভুরিভুরি পাওয়া যায়, অথচ ইসলামে সাক্ষী হওয়ার পূর্বশর্তই হচ্ছে, মুসলমান আর ধর্মীয় ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হওয়া। যথা চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে কাফিরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ক্রয়-বিক্রয়, তথা লেনদেনের ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে বলে মুফতীয়ানে কেরাম মতামত ব্যক্ত করেছেন।

এখন আপনারাই বিবেচনা করুন, যে ইতিহাসের মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রধানত ইহুদি-খ্রিস্টানেরই বর্ণনা, সে ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে সাহাবায়ে কেরামের নিষ্কলুষ চরিত্রে কলঙ্কের তিলক এঁটে দেয়ার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। ওই দলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে কী বলব, যে নিজেকে একজন ইসলামী গবেষক, বুদ্ধিজীবী, স্কলারসহ আরো কত বিশেষণে ভূষিত হতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, সে কিছু সম্পূর্ণ অনুমাননির্ভর বর্ণনাকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সাহাবায়ে কেরামের চরিত্রে অপবাদ আরোপ করাকে নিজ দলের প্রধান আলামত হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর তার অন্ধ অনুসারীরা সে মতবাদের প্রচার-প্রসারে নিজেদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে? শত আফসোস! ইতিহাসের এসব অসার বর্ণনাকে তারা বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু কুরআনের ওই সব সুস্পষ্ট আয়াতের প্রতি যেন তারা ভ্রূক্ষেপই করছে না, যেসব আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের স্তুতি গাওয়া হয়েছে এবং তাদের অনুসরণেই মানবজাতির চূড়ান্ত সফলতা নিহিত রয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তারা সাহাবায়ে কেরামের ভুল-ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে করে একটি স্বতন্ত্র দল প্রতিষ্ঠা করে। এখন আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি, এমন নাজুক সন্ধিক্ষণে আমাদের দায়িত্ব কী? কর্মপন্থা কী ধরনের হওয়া উচিত? মোটকথা, এখন পুরো বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রথম গ্রুপ হচ্ছে, যারা সাহাবায়ে কেরামের ইজ্জত-আব্রু নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অপপ্রয়াসে ব্যাপৃত, তারা সাহাবায়ে কেরামের অভ্যন্তরীণ মতবিভেদকে জনসম্মুখে নিয়ে এসে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চায়। কোন ভদ্রলোকের পক্ষে কি এ কথা সহ্য করা সম্ভব, কোনো কুলাঙ্গার তার ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলাবে এবং তার দিকে অভিযোগের আঙুল উত্তোলন করবে? তাহলে যারা সাহাবায়ে কেরামের জন্য নিজেদের বুকের তপ্ত খুন ঢেলে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না, তারা কিভাবে সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা সহ্য করবে? সাহাবীদেরকে ইতিহাসের আয়নায় বিষোদগার করা হবে, আর সাহাবীদের সাচ্চা অনুসারীরা চোখ-মুখ বুজে তা সহ্য করবে, এও কি সম্ভব? অথচ কুরআনের ভুরিভুরি আয়াত সাহাবীদের গুণকীর্তনে ভরপুর।

আপনারা যদি আমার আলোচনা ভালভাবে বুঝে থাকেন, তাহলে একটি অনেক বড় চিন্তাগত ভ্রষ্টতার কারণ আপনাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে। তাহলো, যারাই নিজেদের গ্রন্থে সাহাবীদের সমালোচনাসংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা সন্নিবেশিত করে এবং এ খোঁড়া যুক্তিও উপস্থাপন করে যে, আমরা এসব কথা বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্বৃতি দিয়ে লিখছি! ওই কুলাঙ্গারদের বলা উচিত, পবিত্র কুরআনের চেয়ে কি কোনো বড় গ্রন্থ আছে? কোনো ঐতিহাসিক যদি কোনো বর্ণনার মাধ্যমে হযরত উসমান (রা.)-কে সমালোচনার তীরে বিদ্ধ করে, অন্যদিকে হযরত উসমান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে দ্বর্থহীন ঘোষণা হচ্ছে-رضي الله عنهم ورضوا عنه তাহলে কার কথা মান্য করা হবে? তাকে জিজ্ঞেস করুন। সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মানা, নির্ভরযোগ্য স্বীকার করা, এটি সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কুরআনের অন্যতম দাবি। আর সাহাবীদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা, এটি ঐতিহাসিকদের কারসাজি মাত্র। একদিকে মহাগ্রন্থ আল কুরআন, অপরদিকে ইতিহাসের কিছু অসার বর্ণনা, উভয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল তফাতটা উলামায়ে কেরামই ভালো করে বুঝতে পারেন।

এখন দুটি কর্মপন্থা রয়েছে। প্রথমত, হয়তো ওই সব ভ্রান্ত মতবাদের মূল তত্ত্ব অনুধাবন করতে প্রচেষ্টা চালানো হবে, যারা সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি স্বীকার করে না, উপরন্তু তাদের ওপর নানা অপবাদের বোঝা চাপিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণকে এই কথা বোঝাতে চেষ্টা করতে হবে যে, সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি। তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য প্রশংসা-বাণী উচ্চারিত হয়েছে। প্রথম

পদ্ধতিটি অতিশয় দীর্ঘ এবং কঠিনও বটে। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিটি একেবারে সহজ। কিন্তু আমাদের ব্যর্থতা এখানে যে, আমরা প্রথমোক্ত কাজকে যেমন মতবিরোধ সৃষ্টিকারী কাজ বলে অবিহিত করি, তেমনি দ্বিতীয় পদ্ধতিকে একই অভিধায় ভূষিত করতেও কুণ্ঠাবোধ করি না।

একটি হৃদয়গ্রাহী ঘটনা :

আমি লক্ষ্ণৌর নিকটবর্তী ফয়জাবাদের অধিবাসী। লক্ষ্ণৌতে একবার শিয়াদের শাসনামলে আইন পাস হলো যে, সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা এবং গুণকীর্তনের জন্য কোনো প্রোগ্রাম করা যাবে না। আপনাদের অনেকেই দারুল উলুম দেওবন্দের তদানীন্তন মুহতামিম মাওলানা মারগুবুর রহমান (রহ.)-কে হয়তো দেখেছেন। যেহেতু লক্ষ্ণৌতে শিয়াদের আধিক্য ছিল। আর সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা শুনলে শিয়াদের পিত্ত জ্বলে ওঠে। এ নিয়ে বাদানুবাদ আর ঝগড়া-ঝাঁটির কোনো অন্ত ছিল না। শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) লক্ষ্ণৌতে কনফারেন্স আহবান করলেন এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে রক্তের স্বাক্ষর নিয়েছিলেন যে, আমরা সাহাবায়ে কেরামের গুণকীর্তন গাইতে থাকব, এ কারণে আমাদেরকে তাজা খুনের নজরানা পেশ করতে হলেও আমরা পিছু হটব না। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা মারগুবুর রহমান (রহ.) ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ওই সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তির মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ ব্যক্তি, যিনি বিগত কয়েক বছর পূর্বে আপন রবের সান্নিধ্যে পাড়ি জমিয়েছেন। নিজেদের জান বাজি রেখে হলেও সাহাবায়ে কেরামের গুণকীর্তনের ওপর অনুষ্ঠান হবে, এই সিদ্ধান্তটা দিতে বাধ্য হয়েছিল তৎকালীন ইংরেজ সরকার পর্যন্ত। তখনকার একটি ঘটনা তাকে বলা হলো, সাহাবায়ে কেরামের গুণকীর্তন গাওয়া বর্তমান আইনে নিষিদ্ধ। তখন মাওলানা আব্দুশ শাকুর (রহ.) বললেন, এর সরল অর্থ হলো, কুরআন পড়া নিষেধ। কেননা কুরআন পাঠ করা আর সাহাবীদের স্তুতি গাওয়া প্রায় সমার্থক। পবিত্র কুরআনই তো সাহাবায়ে কেরামকে رضى الله عنهم ورضوا عنه এর সম্মানজনক বিশেষণে ভূষিত করেছে। এর চেয়ে বড় গুণকীর্তন আর কী হতে পারে? اولئك هم المفلحون এই ঘোষণাও এসেছে শাশ্বত বাণী কুরআনেই। কুরআনে কারীম শ্রেষ্ঠত্ব এবং বড়ত্বের যত বিশেষণই ব্যবহার করেছে, সেসব বিশেষণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের দলটিই হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র জামা'আত।

আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, যদি আমরা মুসলিম মিল্লাতের সম্মুখে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সঠিক বিশ্বাস এবং আক্বীদা উপস্থাপন করি, তাহলে এটা কি মতবিরোধ সৃষ্টিকারী কাজ বলে বিবেচিত হবে। নিঃসন্দেহে এটি তো সংস্কারমূলক এবং গঠনমূলক কর্মকাণ্ড। সাহাবায়ে কেরামের সাথে উম্মাহর যে আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে, তাই যদি বিনষ্ট হয়ে যায়। তাহলে উম্মাহ সঞ্জীবনী সুধা পান করবে কোথা থেকে? তাই কেউ যদি সাহাবায়ে কেরামের ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবনও দিয়ে দেন এটিও তার জন্য অনেক সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহর দরবারে যে তার মর্যাদা অনেক উঁচুতে হবে তা ইনশাআল্লাহ চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়। এজন্য প্রথমে আমাদের অন্তর স্বচ্ছ থাকা দরকার যে, ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছি তা বিভেদ সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড নয়, বরং পূর্ণ বিশ্বাস এবং দৃঢ়তার সাথে বলতে পারেন যে, এটি অবশ্যই সংস্কারমূলক কাজ। বরং এত বড় কাজ, যার সর্বপ্রথম প্রবক্তা হচ্ছেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। কেননা মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝাণ্ডা সর্বপ্রথম হযরত সিদ্দিক আকবর (রা.) উড্ডীন করেছিলেন। বুখারী শরীফে হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সাক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে যে, قام فى الردة مقام الانبياء

অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কেরাম যে দৃঢ়পদ এবং অবিচলতার সাথে অপশক্তির প্রতিরোধে রণাঙ্গনে নেমে আসেন, হযরত আবু বকর (রা.)ও ঠিক একই পন্থায় মুরতাদদের সমূলে বিনাশ করা পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেননি। আমাদের এই কর্মপন্থার আরেক মূল ভিত্তি হযরত আলী (রা.)। আমাদের এই কাজের আদর্শ হচ্ছেন হযরত হোসাইন (রা.), হযরত যায়েদ ইবনে আলী (রা.), হযরত ইয়াহয়া ইবনে যায়দ ইবনে আলী ইবনে হোসাইন, মুহাম্মদ নফসে যকিয়্যাহ ইবনে আব্দুল্লাহ, ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রা.)। যারা এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে নেতিবাচক কর্মকাণ্ড বলে নাক সিটকায়, তারা ইসলামের মূল রূপ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত নয়। কারণ ইসলামের কালিমাই হচ্ছে, لا اله الا الله এখানেও নেতিবাচক সত্য-মিথ্যার মাঝে যদি সন্ধি করে ইসলাম টিকে থাকে, তাহলে তা কি মদীনার ইসলাম বলে স্বীকৃতি পাবে? আমাদের এসব কর্মকাণ্ডের একটি মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে, আমরা সাহাবায়ে কেরামের ইজ্জত-আব্রুর সংরক্ষণের জন্যই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যারা সাহাবাদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে কার্পণ্য প্রদর্শন করবে, তাদের স্বরূপ উম্মাহর সামনে উন্মোচিত করা। যারা সাহাবায়ে কেরামের সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমরা ভরা মজলিসেও তাদেরকে লাঞ্ছিত করা থেকে পিছপা হবো না।

সাহাবায়ে কেরামকে যারা পরিত্যাগ করেছে : একটি সংশয়-

পরিত্যাগ করার অর্থ কী? অনেকেই বলে, আমরা সাহাবায়ে কেরামকে মানি। ইমামদেরকে মানি। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কিভাবে মান্য করো? আমরা অমুক বিষয়কে মানি। কোনো বিষয়কে মানার মাপকাঠি কী? আমরা যেভাবে স্বীকার করাতে চাই, সেভাবে স্বীকার করো। সাহাবায়ে কেরামকে স্বীকার করার অর্থ যদি এই হয় যে, আমরা তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। তাহলে এটা পাগলেও বিশ্বাস করে। কারণ ইতিহাসে তাদের অনেক দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। আপনারা তাদেরকে মানেন না, অর্থ, আমরা যেভাবে স্বীকার করাতে চাই, সেভাবে মান্যতা করেন না। আমাদের অনেক বন্ধুকে প্রবঞ্চনায় পড়তে দেখেছি, যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা সাহাবায়ে কেরামকে মানো না। তখন তারা বলে, আমরা অবশ্যই সাহাবাদেরকে মানি। আমরা বলি, তোমরা তাদেরকে কী মানো? বাস্তব কথা হচ্ছে, আমরা তো সাহাবীদেরকে নবী দাবি করছি না। আবার সাধারণ মুসলমানের সমতুল্যও দাবি করছি না। আমরা বলছি, সাহাবায়ে কেরামকে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বীকার করতে হবে, الصحابة كلهم عدول অর্থাৎ, প্রত্যেক সাহাবী নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত। এটা আমাদের উত্থাপিত কোনো দাবি নয়, বরং সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এই মৌলিক বিশ্বাসের ওপর একমত। আমাদের দাবির স্বপক্ষে শুধুমাত্র কুরআনের আয়াত এবং হাদীস শরীফগুলো একত্রিত করলেও একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে। তোমরা যদি এটা স্বীকার করে নাও তাহলে তোমাদের সাথে আমাদের আর কোনো দ্বিমত নেই।

বন্ধুরা! আমরা যে ভ্রান্ত মতাদর্শ তথা লা-মাযহাবীদের ব্যাপারে আলোচনা করতে সমবেত হয়েছি, তারা তারাবীর নামায বিশ রাকআত না আট রাকাআত এ নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। তারা জুমু'আর নামাযে এক আযান না দুই আযান, এ নিয়েও ডামাডোল কম করেনি। তারা সাহাবীদের মতকে প্রমাণ মানতে মোটেও প্রস্তুত নয়। তারা সাহাবায়ে কেরামের কর্মপরম্পরাকে বিদ'আত সাব্যস্ত করার মতো দুঃসাহসও দেখিয়েছে। আমাদের আক্বীদা হচ্ছে প্রত্যেক সাহাবী বিশ্বস্ত। তাদের মতবাদ হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম বিশ্বস্ত নয়, বরং তারা রাসূল (সা.)-এর পর বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বিদ'আত ছিল, তারা মসজিদে নববীতে জামা'আতের সাথে বিশ রাক'আত তারাবীর নামায আদায় করেছেন। এটি বিদ'আতে উমরী (হযরত উমর কর্তৃক প্রবর্তিত বিদ'আত) আমি পরবর্তীতে তারাবীহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাতের চেষ্টা করব। এখন শুধু এতটুকু স্মরণ রাখুন, অনেকেই যখন হাদীস নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, তখন তার সামনে এই বর্ণনা আসে যে, তারাবীর নামায ফরয নয়, হযরত উবাই ইবনে কা'ব স্বীয় বাসগৃহে মেয়েদেরকে আট রাক'আত তারাবীহ পড়িয়েছেন। রাসূল (সা.) অমুক অমুক রাত্রে আট রাক'আত তারাবীহ পড়িয়েছেন। হযরত জাবিরের বর্ণনায় আট রাক'আতের উল্লেখ আছে, হযরত আয়েশার বর্ণনায় আছে এগার রাক'আতের কথা। সব বর্ণনা সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ! তখন ওই বিদ্বান ব্যক্তি প্রবঞ্চণায় পড়ে যান যে, আট রাক'আত তারাবীহর স্বপক্ষেও তো প্রমাণাদি রয়েছে। আমি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলছি, এই মতবিরোধটা আট রাক'আত আর বিশ রাক'আতের নয়। তাদের সাথে আমাদের মূল মতবিরোধ এখানে যে, কোনো সাহাবী কি বিদ'আতী হতে পারে? আট আর বিশ রাক'আতের মতবিরোধ তো তাত্ত্বিক বিষয়। এটা তো রাসূলের ভাষায় উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ। তাদের সাথে আমাদের মূল মতবিরোধ এখানে নয়। তাই যারা নিজেদের অবস্থান এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখেন না, এমন অনেক কেতাদুরস্ত লোককে বলতে শুনি, মাওলানা! এত চিন্তার কী আছে? তারা আট রাক'আত পড়ে, আপনারা বিশ রাক'আত পড়ুন। অথচ আট আর বিশ নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তারাবীহ না পড়লেও আমাদের টেনশন নেই। কারণ অনেক মুসলমান তো ঈদ আর জুমু'আর নামাযের পর্যন্ত ধার ধারে না। আমাদের মূল মাথাব্যথা এখানে, পুরো উম্মাহর ঐকমত্য রয়েছে, الصحابة كلهم عدول প্রত্যেক সাহাবী বিশ্বস্ত। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র লা-মাযহাবীরা। তাদের দাবি সাহাবায়ে কেরাম নাকি জামা'আত সহকারে বিশ রাকআত তারাবীর প্রবর্তন করে বিদ'আতে লিপ্ত হয়েছেন। এখানেই মূল সমস্যা। এখন আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি, যেসব কথা আমি আপনাদেরকে উপস্থাপন করেছি, সেগুলো যদি আপনারা জনসাধারণের সামনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেন, কেউ কি আপনাদেরকে মতবিরোধ সৃষ্টিকারী বলার স্পর্ধা দেখাবে? আমি বলে থাকি, রাসূল (সা.) যা করেছেন এবং বলেছেন, তাই সুন্নাত। অন্যকিছু সুন্নাত নয়। তাহলে আমি জিজ্ঞেস করি, আযানকে কী বলবে? কারণ রাসূল (সা.) পুরো জিন্দেগীতে কখনো আযান দেননি। যদি সুন্নাতকে শুধুমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাজকর্মে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে যে আযানকে শুধুমাত্র সুন্নত নয়, বরং শি'আর তথা ইসলামের নিদর্শন আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কী বলা হবে? তাদের এই ভ্রান্তির কারণ কী? কারণ তারা সাহাবীর কাজকর্মকে সুন্নাত বলে

স্বীকার করেন না। আমরা সাহাবীর মতামতকেও গ্রহণ করি। যেমন, কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় যদি সাহাবীর মত পাওয়া যায়, তাহলে তা সমস্ত মুফাসসিরীনে কেরামের ওপর প্রাধান্য পাবে। সাহাবীদের তাফসীর যেমন নির্ভরযোগ্য, তেমনি তাদের তা'বীলও প্রণিধানযোগ্য।

লা-মাযহাবীদের সাহাবা বিদ্বেষ :

যুগে যুগে অনেক ভ্রান্ত দল সাহাবীদেরকে সমালোচনার নিশানা বানিয়ে আসছে। তন্মধ্যে বর্তমানের বেরেলভী, জামা'আতে ইসলামসহ অনেক দলের নাম আসে। বেরেলভীরা বাহ্যত যদিও সাহাবীদেরকে অনেক সম্মান করে থাকে কিন্তু কর্মগত দিক থেকে তারাও সাহাবায়ে কেরামকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারেনি। আবুল আলা মওদুদী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা'আতে ইসলাম তাদের মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে অনেক আগেই সরে এসেছে, যদিও কিছু কিছু সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা এখনও অল্প অল্প নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিতে প্রয়াস চালাচ্ছে। কিন্তু তারা যে মারাত্মক আক্বীদাটি ছড়িয়ে দিয়েছে, সেটি হচ্ছে শুধুমাত্র রাসূল (সা.)-এর সত্তা ছাড়া অন্য কেউ সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না। মাওলানা মনজুর নোমানী (রহ.) জামা'আতে ইসলামের প্রথম বৈঠকের রিপোর্ট থানাবুনে হযরত থানভী (রহ.)-এর কাছে পাঠান। তখন পর্যন্ত জামা'আতে ইসলাম সমালোচনার মুখে পড়েনি। তখন খানকায় যারা অবস্থান করতেন, যথা হযরত থানভী (রহ.), মাওলানা আব্দুল্লাহ (রহ.) মাওলানা যফর আহমদ উসমানী (রহ.) প্রমুখ তারা এই বলে উত্তর লিখে পাঠান যে, তাদের কর্মকাণ্ডকে অন্তর সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করছে না। হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন এই দলটি নিজেও পথভ্রষ্ট, অপরকেও পথভ্রষ্ট করতে অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। শায়খুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (রহ.) আকাবিরদের নির্দেশে বড় একটি প্রবন্ধ রচনা করেন, যেখানে জামা'আতে ইসলামের ভুল-ত্রুটিগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, জামা'আতে ইসলাম ধর্মের পবিত্র ছদ্মবেশে রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের অপচেষ্টায় লিপ্ত। স্পষ্ট কথা, রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারে সে যখন ব্যস্ত, তখন সে রাষ্ট্র পরিচালনাও করতে চাইবে। অথচ সে পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের অনির্ভরযোগ্য বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে সাহাবায়ে কেরামের যথেচ্ছ সমালোচনায় মেতে ওঠে।

আমার আলোচনার বিষয় হলো, সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি কি না? তারা সত্য পথের ওপর ছিলেন, এ কথা তো সবাই অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে। লা-মাযহাবীরা কিন্তু সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মানতে মোটেও প্রস্তুত নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা সাহবায়ে কেরামের আলোচনা করতে গিয়ে এমন সব অকথ্য এবং অশ্রাব্য মন্তব্য করেছে, যা কোনো সাধারণ মুসলমানের জন্য ব্যবহার করা সমীচীন নয়। সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে তাদের অশালীন মন্তব্যগুলো তাদেরই রচিত গ্রন্থ থেকে আগামী সংখ্যায় উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ। যাতে তাদের আসলরূপ পাঠকদের সামনে উন্মোচিত হয়।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গ্রন্থনা ও অনুবাদ :
হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার

মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একমাত্র মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম। ইসলামের আবেদন অপরিসীম; এর বিশালতা ও গভীরতার সাথে কোনো কিছুর তুলনা কল্পনাতীত। চৌদ্দশ বছর পূর্বে ইসলাম যেমন ছিল তরুণ, সজীব ও সতেজ, তেমনি আজকের ইসলামও তার সেই তারুণ্য আর সজীবতায় দীপ্তমান। দীর্ঘ চৌদ্দশ বছর যাবৎ ইসলাম তার সুর ও ছন্দ বজায় রেখেছে, অক্ষুণ্ন রেখেছে নিজস্ব ভাবধারা ও গতিময়তা। ইসলাম চির সজীব। কেননা সকল প্রতিকূলতা থেকে ইসলামকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, অসীম সত্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। আর তিনিই তো এর রক্ষক।

কিন্তু কালের পটপরিবর্তনে ইসলামের সেই চৌদ্দশ বছরের দেদীপ্যমান দীপ্তি মুসলিম উম্মাহের কাছে আজ তেজহীন, নিষ্প্রভ। মুসলমান আজ চরম বিপর্যয়ের মুখে। বিগত কয়েক শতাব্দী থেকে শুরু হওয়া সেই বিপর্যয়ে মুসলমান আজ দিশেহারা। বর্তমান সময়ে মুসলমানদের এই বিপর্যয় পূর্বের তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আক্রমণের পাশাপাশি স্নায়ুবিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ চলছে। পদ্ধতিগতভাবে এই আক্রমণ এতটাই পরিকল্পিত ও সুতীক্ষ্ম যে, স্বয়ং মুসলমানরাই অজ্ঞতাবশত সে আক্রমণের প্রতিনিধিত্ব করছে।

বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ইসলামকে বিপর্যস্ত করা তথা ইসলামের মূল আক্বীদা, বিশ্বাস ও তাহযীব-তামাদ্দুনকে বিকৃত করার প্রয়াস সুদূরপ্রসারী। এ ক্ষেত্রে অমুসলিমরা যেমন–প্রত্যক্ষভাবে ইসলামের মূল আক্বীদা-বিশ্বাস বিকৃত করার অপচেষ্টা করে থাকে, তেমনিভাবে মুসলমানদের একটা শ্রেণী তাদের সেই অপচেষ্টার প্রতিনিধিত্ব করে। ওরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্যবিদরা এ বিষয়ে ইসলামের সর্বাধিক ক্ষতি সাধনে লিপ্ত। এদের কেউ নামধারী মুসলমান, আবার কেউ অমুসলিম। এ সমস্ত বুদ্ধিজীবীর অপপ্রচারে মুসলমানদের অনেকেই বিভ্রান্ত হয় এবং তাদের একই ভাবধারায় পরিচালিত হয়।

মুসলমানদের এই ক্রান্তিলগ্নে মাযহাবের ওপর আলোচনা একটি গৌণ বিষয়। মুসলমানদের মাঝে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত হক্ব বিষয়ের ওপর বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানো কোনোভাবেই কাম্য নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলমানদেরই একটা শ্রেণী এই অপচেষ্টায় তৎপর। এরা লা-মাযহাবী নামে পরিচিত।

এরা সর্বসাধারণের মাঝে চার মাযহাবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অমূলক উক্তি ও প্রপাগাণ্ডা ছড়িয়ে থাকে। এবং কিছু কিছু শাখাগত মাসআলা নিয়ে অযৌক্তিক বিতর্ক সৃষ্টি করে ফিতনার জন্ম দেয় এবং সাধারণ মানুষের মনে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহের বীজ বপন করে। এদের যুক্তি হলো, "এক কুরআন, এক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তবে চার মাযহাব মানব কেন"; কিন্তু তাদের এ স্লোগান মুখের কথাতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের মাঝেও আক্বিদা থেকে শুরু করে শাখাগত অসংখ্য বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, "স্বেচ্ছাচারিতা এবং প্রবৃত্তিপূজার" কারণে তাদের এক দলই আরেক দলকে কাফের-মুশরিক ইত্যাদি বলে থাকে। পক্ষান্তরে দীর্ঘ তেরশ বছর যাবৎ মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্যের ভিত্তিতে চার মাযহাবের ওপর আমল করে আসছে। চার মাযহাবের ওপর আমল করা সত্ত্বেও তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, ঐক্য ও সংহতি বজায় রয়েছে। অন্যকে বাতিল বলা তো দূরে থাক, অন্য মাযহাবের কারও প্রতি কোনো বিরূপ মনোভাব রাখার বিষয়টিকেও নিন্দনীয় মনে করা হয় এবং প্রত্যেক মাযহাবের ইমামগণও তাঁদের অনুসারীদেরকে যারপরনাই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ওপর ডা. জাকির নায়েক বর্তমান সময়ের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। দুঃখজনক হলো, বর্তমানে ডা. জাকির নায়েক তাঁর দাওয়াতের ক্ষেত্র ও পরিমণ্ডল অতিক্রম করেছেন। তিনি মুফতী, মুহাদ্দিস কিংবা মুফাসসির নন। মাসআলা-মাসায়েল বা ফতওয়া প্রদানের যোগ্য না হয়ে কারো জন্য এ পথে অগ্রসর হওয়াটা কখনও যৌক্তিক হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তিনি যেহেতু মাসআলার সমাধান দেয়ার যোগ্য নন, এ জন্য তিনি যে সমস্ত মাসআলা দিয়ে থাকেন, এর অধিকাংশ মাসআলা মূলত সালাফী বা আহলে হাদীসদের থেকে নেয়া। বাস্তব সত্য হলো, এ ক্ষেত্রে তিনি কথিত সালাফী বা লা-মাযহাবীদের প্রতিনিনিধিত্ব করে থাকেন।

"ভাঙা তরীতে পাড়ি দিয়েছি
অথৈ সাগর মোরা;
যেখানেই পানি কম ছিল হায়!
তরী ডুবে হলো সারা"

ডা. জাকির নায়েক ফিকহের বিষয়ে অভিজ্ঞ না হয়েও বিভিন্ন বিষয়ে ফতওয়া প্রদান করায় তিনি সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত হয়েছেন। তাঁর এ সমস্ত ভুল মাসআলা সম্পর্কে অনেকেই হয়তো অবগত। ফিকহের বিষয়ে ভুল মাসআলা দেয়ার পাশাপাশি তিনি মাযহাব প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর পর্বে এবং বিশেষভাবে "ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ" শিরোনামের লেকচারে বিভিন্ন ধরনের অমূলক উক্তি করেছেন। এ লেকচারে

তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাযহাবকে ইসলামবহির্ভূত একটি বিষয় হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ডা. জাকির নায়েক চার মাযহাব সম্পর্কে যে সমস্ত অমূলক উক্তি করেছেন এখানে সে সমস্ত বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

ডা. জাকির নায়েক কাদের অনুসারী?

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী (সা.)-কে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে দ্বীন শিখিয়েছেন। সাহাবীগণ সরাসরি রাসূল (সা.)-এর নিকট দ্বীন শিখেছেন। সাহাবীগণ (রা.) তাবেয়ীদেরকে এবং তাবেঈগণ তাদের ছাত্র তাবে-তাবেঈগণকে দ্বীন শিখিয়েছেন। এভাবে ইসলামী শিক্ষার ধারা অদ্যবধি চলে এসেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে একটি দুঃখজনক বিষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, একশ্রেণীর মানুষ দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার এই ধারার প্রতি কোনো রূপ ভ্রূক্ষেপ না করে স্বশিক্ষিত হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছেন। এবং তাদের নিজস্ব বুঝ অনুযায়ী দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের মতামত অবলীলায় পেশ করে যাচ্ছেন।

আমরা প্রত্যেকেই অবগত যে, ডা. জাকির নায়েক পেশাগত একজন ডাক্তার। দ্বীনের বিষয়ে তিনি মৌলিক জ্ঞানের জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা করেননি। তিনি তাঁর বক্তৃতা কিংবা বাস্তব জীবনে কাদের মতাদর্শ অনুসরণ করেন এবং কাদের ওপর নির্ভর করেন, সে বিষয়টির ওপর তার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করছে। তিনি কাকে অনুসরণ করে থাকেন, ডাক্তার জাকির নায়েকের কথা গ্রহণ করার পূর্বে সে বিষয়টি আমাদের নিকট স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক।

ডা. জাকির নায়েক তাঁর Unity in the Muslim Ummah শিরোনামের লেকচারে শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী সম্পর্কে বলেছেন–

১। Many of my talks are based on his research, Mashallah, মাশাআলাহ! আমার অনেক লেকচার শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীর গবেষণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

২। I am nothing compare to him, I am not even a drop in the ocean compare to Nasiruddin Albani.

"আমি তাঁর তুলনায় কিছুই নই। নাসীরুদ্দিন আলবানী সাগরতুল্য হলে আমি তার তুলনায় এক ফোঁটা পানির সমতুল্যও নই।"

(http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/

উপরোক্ত আলোচনাটি ইউটিউবে এ শিরোনামে পাওয়া যাবে- Dr. Zakir Naik talks about salafi_s _ AHL E HADITH - YouTube)

৩। See for example I am lay, what I say in talk I do my research, but more knowledge in my head or my brain, which I haven't checked up, but yet I classify. For example, if I hear a statement from Shiekh Nasiruddin Albani, Mashallah, who has died recently, according to me he is one of great Muhaddis of the recent times. What he says, I follow on the face of it, because I checked up, the scholar Mashallah following Quran and Sahih Hadith.

"উদাহরণস্বরূপ! আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমি আমার লেকচারে যা বলি, সেগুলো নিয়ে আমি গবেষণা করে থাকি। কিন্তু আমার মাথায় বা ব্রেনে আরও অনেক জ্ঞান রয়েছে, যেগুলো আমি অনুসন্ধান করতে পারি না। তবে আমি এর জন্য স্কলারদের শ্রেণীবিভাগ করেছি। উদাহরণস্বরূপ, যদি শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীর পক্ষ থেকে কোনো বর্ণনা পাই, আমার মতে তিনি বর্তমান সময়ের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি যা বলেন, আমি সে অনুসারে চলি। কেননা আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি, মাশাআল্লাহ! তিনি কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করেন।

(http://www.youtube.com/watch?v=Szzn9lFg9n0 ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/)

৪। So if some on gives the Fatwa, local person from here and Nasiruddin Albani, I believe Nasiruddin Albani, if I don't have time. But what I say in the lecture I check up, because I am responsible for that. But for my own knowledge, if I have to make a opinion, I can't check up every Hadith, difficult! Difficult for a lay man.

"এখানকার কোনো সাধারণ ব্যক্তি যদি কোনো ফতওয়া প্রদান করে এবং শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী যদি কোনো ফতওয়া প্রদান করেন, তবে আমি শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীকে বিশ্বাস করব, যদি আমার নিকট যথেষ্ঠ সময় না থাকে।

কিন্তু আমার লেকচারে আমি যা বলি, সেগুলো আমি যাচাই করে থাকি। কেননা এর জন্য আমি দায়বদ্ধ। কিন্তু আমার নিজের জ্ঞানের জন্য যদি কোনো বিষয়ে আমার কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তবে আমি সব হাদিস যাচাই করে দেখতে পারি না। এটি অনেক কঠিন! একজন সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কঠিন! (প্রাগুক্ত)

ইসলামী বিষয়ে ডা. জাকির নায়েক তার লেকচারের জন্য শায়েখ নাসরুদ্দিন আলবানীর ওপর নির্ভর করেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে থাকেন।

শায়েখ নাসীররুদ্দিন আলবানীকে সালাফীরা বর্তমান সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ

মুহাদ্দিস মনে করে থাকে। যেমনটি ডা. জাকির নায়েকও মনে করেন। সালাফী মাযহাবকে যারা বেগবান করেছে, বর্তমান সময়ে শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীকে তাদের পুরোধা বলা যায়। ডা. জাকির নায়েক যেহেতু শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীসহ অপরাপর সালাফী বা আহলে হাদীসদের ওপর নির্ভর করেন এবং তাদের শিক্ষা প্রচার করে থাকেন, এ জন্য ডা. জাকির নায়েককে লা-মাযহাবী দলের প্রচারক বা তাদের ব্যাখ্যাকার বলা যায়।

He is regarded as an exponent of the Salafi ideology

"ডা. জাকির নায়েককে সালাফী মাযহাবের ব্যাখ্যাকার মনে করা হয়।"

(Roel Meijer's Global Salafism: Islam's new religious movement, Columbia University Press, 2009

Warikoo, Kulbhushan; Religion and security in South and Central Asia, Taylor & Francis, 2010

http://en.wikipedia.org/wiki/Zakir_Naik#cite_note-4)

অবশ্য ডা. জাকির নায়েক "ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ" শিরোনামের লেকচারে সালাফী ও আহলে হাদীসদের সমালোচনা করেছেন; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সালাফী লা-মাযহাবী মাযহাবে বিশ্বাসী নন। শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীসহ অন্য সালাফীদের অনুসরণ এবং তাদের মতাদর্শ প্রচার করাটাই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এ ছাড়া একজন লা-মাযহাবীর লেখা একটি বই পড়ুন এবং ডা. জাকির নায়েকের লেকচার শুনুন! এ দুয়ের মাঝে মৌলিক দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। মাযহাবীদের ব্যাপারে তারা যে সমস্ত অভিযোগ করে থাকে, ডা. জাকির নায়েক তার লেকচারে হুবহু সেগুলো উল্লেখ করেছেন, বরং অনেক ক্ষেত্রে তিনি তাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

সালাফীদের কারণে মুসলিম উম্মাহের যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো "ফিতনাতুত তাকফীর" তথা অন্যকে কাফের বলার প্রবণতা। ইসলামের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের প্রতি ন্যূনতম কোনো সম্মান তো তারা প্রদর্শন করেই না, বরং তাদেরকে কাফের-মুশরিক ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করে। এই ফিতনা এতটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, পূর্ববর্তী কোনো বুযুর্গের প্রতি কোনো সম্মান তাদের নিকট যেন কোনো বিবেচনার বিষয়ই নয়। অথচ তারা নিজেদেরকে "সালাফী" (পূর্ববর্তীদের অনুসারী) হিসেবে প্রকাশ করে থাকে।

বর্তমান সময়ে সালাফী আন্দোলনকে সবচেয়ে বেশি বেগবান করেছেন, শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী। তিনি তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিখ্যাত কোনো মুহাদ্দিস বা ফকীহকেই তার সমালোচনা থেকে বাদ দেননি। তিনি শুধু সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, অনেক ক্ষেত্রে অশালীন শব্দও ব্যবহার করেছেন, যা কোনো আলেম নন বরং সাধারণ শিক্ষিতের কাছ থেকে আশা করা যায় না। এর কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

হানাফী মাযহাবকে খ্রিস্টধর্মের সাথে তুলনা :

শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী হানাফী মাযহাবকে খ্রিস্টধর্মের সাথে তুলনা করে লেখেন,

هذا صريح فى ان عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا ويقضى بالكتاب والسنة لا بغير هما من الانجيل او الفقه الحنفى ونحوه

"এ থেকে স্পষ্ট যে, হযরত ঈসা (আ.) আমাদের শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা দেবেন এবং কিতাব ও সুন্নাহের মাধ্যমে বিচার করবেন। তিনি ইঞ্জিল, হানাফী ফিকহ কিংবা এ-জাতীয় অন্য কিছু দ্বারা বিচার করবেন না।"

(تعليقه على كتاب الحافظ المنذرى (مختصر صحيح مسلم) الطبعة الثالثة سنة ١٩٧٧ المكتب الاسلامى ص٥٤٨)

(আল্লামা মুনযীরি (রহ.) কৃত "মুখতাসারু সহিহীল মুসলিম"-এর ওপর শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীর টিকা সংযোজন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭, আল-মাকতাবুল ইসলামী, পৃষ্ঠা-৫৪৮]

এখানে শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী খুব সহজে হানাফী মাযহাবকে খ্রিস্টধর্মের বিকৃত ইঞ্জিলের সাথে তুলনা করেছেন; অথচ তিনি এতটুকু চিন্তা করেননি যে, তাঁর নিজের পিতা একজন সুদৃঢ় হানাফী আলেম। আমরা সকলেই জানি, কেউ যদি ইঞ্জিল অনুযায়ী বিবাহ-শাদী করে, তবে ইসলামে তার বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না।

শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানীর নিজের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর পিতা এমন একটি মতবাদের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, যা বিকৃত ইঞ্জিলের সমগোত্রীয়। এখন তিনি যদি হানাফী মাযহাবকে বিকৃত ইঞ্জিলের সাথে তুলনা করেন, তবে আমাদের কারও আপত্তি করার পূর্বে তাঁর নিজেরই সতর্ক হওয়া উচিত। কেননা এ কথা বলার দ্বারা তার নিজের পিতা-মাতারই বিবাহ বিশুদ্ধ হয় না।

এ ছাড়া তিনি জীবনের দীর্ঘ একটি সময় নিজেও হানাফী ছিলেন। তাঁর জীবনীতে লেখা হয়েছে,

الحنفى (قديما)، ثم الامام المجتهد بعد

"প্রথম জীবনে হানাফী, পরবর্তী জীবনে নিজেই মুজতাহিদ ইমাম।"

[সাবাতু মুয়ালাফাতিল আলবানী, আব্দুলাহ ইবনে মুহাম্মাদ আশ্-শামরানী, পৃষ্ঠা-২, ১৬]

তিনি যদি হানাফী মাযহাবকে ইঞ্জিলের সমতুল্য মনে করে থাকেন, তবে তিনি প্রথম জীবনের যে সময়টাতে হানাফী ছিলেন সে সময়ে তিনি কি মুসলমান ছিলেন?

উস্তাদের অবস্থা যদি হয় এই, তবে তার অনুসারীদের কী অবস্থা হবে? ডা.

জাকির নায়েক এমন এক ব্যক্তিকে অনুসরণীয় বানিয়েছেন, যিনি সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে এবং হককে বাতিলের সঙ্গে মিশ্রিত করতে সামান্যতম দ্বিধা করেন না!

শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীর মতো ডা. জাকির নায়েকও একই পথে অগ্রসর হয়েছেন। শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীর উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে ডা. জাকির নায়েকের নিচের বক্তব্যটি মিলিয়ে দেখুন।

Imam Abu Hanifa never came to start a new Hanafi Madhab. Imam Malek never came to start a new Maleki Madhab. Imam Shafi never came to start a new Shafi Madhab. Imam Ahmad Ibn Hambol never came to start a new hamboli Madhab. All of them followed the Madhab of the Rasul. Like how the Christian misunderstood Jesus (pbuh) never came to start Christianity, he came to Islam.

"ইমাম আবু হানীফা নতুন কোনো হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করেননি। ইমাম মালেক নতুন কোনো মালেকী মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করেননি। ইমাম শাফেঈ নতুন কোনো শাফেঈ মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করেননি। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) হাম্বলী মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করেননি। এদের মাযহাব ছিল রাসূল (সা.)-এর মাযহাব। বিষয়টি খ্রিস্টানদের মতো, অর্থাৎ খ্রিস্টানরা যেমন ভুল বুঝে থাকে যে, হযরত ঈসা (আ.) খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছিলেন; মূলত তিনি এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য।"

(ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, পার্ট-৩, ২ মিনিট, ১৩ সেকেন্ড, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/)

বর্তমান বিশ্বে ৯২.৫ ভাগ মুসলমান চার মাযহাবের কোনো একটি অনুসরণ করে থাকে এবং অবশিষ্ট ৭.৫ ভাগ লোক শিয়া মতাবলম্বী।

(How Many Shia Are in the World?". IslamicWeb.com. http://islamicweb.com/?folder=beliefs/cu lts&file=shia_population. 2006-10-18.)

দীর্ঘ তেরশ বছর যাবৎ মুসলিম উম্মাহ মাযহাবের অনুসরণ করে আসছে, তবে কি তিনি সব মুসলমানকে খ্রিস্টানদের মতো পথভ্রষ্ট মনে করেন?

এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, ডা. জাকির নায়েক যাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী, তারা মাযহাব মানাকে কুফুরী-শিরকী মনে করে থাকে। তাদের অনুসারী হয়ে ডা. জাকির নায়েকের পক্ষে এ ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করাটা অস্বাভাবিক নয়। শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী যেমন হানাফী মাযহাবকে খ্রিস্টধর্মের সাথে তুলনা করেছে, তার অনুসারী হয়ে ডা. জাকির নায়েকও হুবহু তা-ই করেছে!

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)-এর প্রতি অভিশাপ :

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) সম্পর্কে শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী লেখেন–

اشل الله يدك وقطع لسانك يدعو على العلامة الشيخ عبد الفتاح ابى غدة ويقول عنه : انه غدة كغدة البعير ثم يقول مستهزئا ضاحكا: اتعرفون غدة

"আল্লাহ তা'আলা তোমার হাত অবশ করে দিক এবং তোমার জিহ্বাকে কর্তন করুক। [কাশফুন নিকাব, পৃষ্ঠা-৫২]

তিনি আরও বলেন, সে হলো উটের প্লেগ রোগের মতো একটা মহামারি (গুদ্দাতুল বায়ীর)। অতঃপর তিনি হাসতে হাসতে উপহাস করে বললেন, তোমরা কি জানো, উটের প্লেগ কী?

(http://www.youtube.com/watch?v=yRpKoWWUECU&feature=player_embedded)

শায় আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ :

শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (১৩৩৬/১৯১৭-১৪১৭/১৯৯৭) যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের অন্যতম। মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি এবং কিং সাউদ ইউনিভার্সিটিতে দীর্ঘ ২৫ বছর শিক্ষকতা করেছেন। তিনি ১৯৭৬ সালে সুদানের Um Durman Islamic University: এবং ১৯৭৮ সালে ইয়েমেনের সানআ' ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। শায়েখের জীবদ্দশায় তাঁর ৬৫ খানা কিতাব প্রকাশিত হয়।

শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী মূলত ইবনে হাযাম যাহেরীর অনুসরণ করে থাকেন। ইবনে হাযাম যাহেরী (রহ.) যে সমস্ত ক্ষেত্রে যে সকল পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, অধিকাংশ পদ্ধতি শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীর মাঝে পাওয়া যায়। যেমন, হাদীস সহীহ বা যয়ীফ বলার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা। এমন সব বিকৃত মাসআলা প্রদান, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষভাবে, উলামায়ে কেরামের প্রতি অশালীন শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত। আমার ধারণা মতে, এ বিষয়টিও তিনি ইবনে হাযাম (রহ.)-এর কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম যাহাবী (রহ.) ইবনে হাযাম (রহ.) সম্পর্কে লেখেন–

ইমামদের প্রতি সে অশালীন শব্দ ব্যবহার করেছে বরং তাদের সম্পর্কে কটূক্তি করেছে, তাদেরকে গালি দিয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে অশ্লীল উক্তি করেছে। সুতরাং তাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হয়েছে এবং উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে তার লাগামহীন ভাষার কারণে সে মুসীবতের সম্মুখীন হয়েছে।"

[সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খণ্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১৮৪]

ড. ইউসুফ আল-কারযাবী সম্পর্কে আলবানীর উক্তি :

তিনি ড. ইউসুফ আল-কারযাবী সম্পর্কে বলেছেন–

اصرف نظرك عن القرضاوى واقرضه قرضا

"তুমি ইউসুফ কারযাবী থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখো এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো।"

তিনি ড. ইউসুফ আল-কারযাবী সম্পর্কে আরও বলেছেন,

ان يوسف القرضاوى يفتى الناس بفتاوى مخالفة للشريعة وله فلسفة خطيرة

"ইউসুফ আল-কারযাবী শরীয়তবিরোধী ফতোয়া প্রদান করে, তার কাছে রয়েছে ভয়ঙ্কর সব দর্শন।"

(http://www.youtube.com/watch?v=yRpKoWWUECU&feature=player_embedded)

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)

হাদীসুল গদীর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) সম্পর্কে লেখেন,

إننى رأيت شيخ الاسلام ابن تيمية ، قد ضعف الشطر الاول من الحديث، واما الشطر الآخر، فزعم انه كذب! وهذا من مبالغاته الناتجة فى تقديرى من تسرعه فى تضعيف الاحاديث قبل ان يجمع طرقها ويدقق النظر فيها والله المستعان

"আমি শায়খ ইবনে তাইমিয়াকে দেখেছি, তিনি হাদীসের প্রথম অংশকে দুর্বল বলেছেন এবং হাদীসের শেষ অংশকে তিনি মিথ্যা মনে করেছেন। আমার ধারণামতে, "হাদীসকে যয়ীফ বলার ক্ষেত্রে এটি ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর বাড়াবাড়ি, যা তাঁকে হাদীসটি যয়ীফ বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে; অথচ তিনি হাদীস বর্ণনার বিভিন্ন সনদ খতিয়ে দেখেননি। এবং এ ব্যাপারে গভীর দৃষ্টিপাত করেননি।"

[সিলসিলাতুস সহীহা, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৪৩-৩৪৪, হাদীস নং ১৭৫০]

শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী পৃথিবী বিখ্যাত অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহের সমালোচনা করেছে। সালাফীরা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) এবং আব্দুল ওহাব নজদী (রহ.)-কে তাদের মাইলফলক মনে করে থাকে। কিন্তু শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী সমস্ত আলেমের ক্ষেত্রে সব ধরনের নিয়ম-কানুনের দেয়াল ভেঙে দিয়েছে এবং যেখানে যেভাবে ইচ্ছা তার সমালোচনা করেছে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) "কালিমুত তাইয়্যিব" নামক বিখ্যাত একটি কিতাব রচনা করেছেন। শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী সে কিতাবের হাদীসগুলো বিশ্লেষণ করে একটি কিতাব লিখেছে, সহীহুল কালিমিত তাইয়্যিব। এ কিতাবে নাসীরুদ্দিন আলবানী লিখেছে-

انصح لكل من وقف على هذا الكتاب (الكلم الطيب لابن تيمية) وغيره: ان لا يبادر الى العمل بما فيه من الاحاديث الا بعد التأكيد من ثبوتها، وقد سهلنا له السبيل الى ذلك بما علقنا عليه، فما كان ثابتا منها عمل به ـــ والا تركه (صحيح الكلم الطيب ص٤)

"যারা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর এ কিতাবটি সম্পর্কে অবগত রয়েছে, তাদেরকে নসীহত করব, এ কিতাবে যে সমস্ত হাদীস রয়েছে, সেগুলোর প্রতি তারা যেন আমল করতে অগ্রসর না হয়, যতক্ষণ না হাদীসগুলো শক্তিশালীভাবে প্রমাণিত হয়। আমি এর ওপর যে টিকা সংযোজন করেছি, এর মাধ্যমে প্রত্যেকের জন্য বিষয়টি সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং যে সমস্ত হাদীস প্রমাণিত হবে, সেগুলোর ওপর আমল করা হবে, নতুবা সেটি পরিত্যাগ করা হবে।"

[সহীহুল কালিমিত তাইয়্যিব, পৃষ্ঠা-৪]

নাসীরুদ্দিন আলবানীর এ কথা উল্লেখ করে আল্লামা হাবীবুর রহমান আজমী (রহ.) লেখেন,

وليس يعنى الالبانى بذلك الا انه يجب على الناس ان يتخذوه اماما ويقلدوه تقليدا اعمى، ولا يعتمدوا على ابن تيمية ولا على غيره من الثقات الاثبات من المحدثين ، فى ثبوت الاحاديث حتى يسألوا الالبانى ويرجعوا الى تحقيقاته۔

"অর্থাৎ নাসীরুদ্দিন আলবানীর এ কথা বলার দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন আবশ্যকভাবে তাকে ইমাম বানায় এবং তার অন্ধ অনুকরণ করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আলবানীকে জিজ্ঞেস না করবে এবং তার বিশ্লেষণকে গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লামা ইবনে তাইমিয়াসহ অন্য কোনো বিশ্বস্ত ও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী মুহাদ্দিসের হাদীসের ওপরও নির্ভর করবে না।"

(আল-আলবানী, শুযুযুহু ও আখতাউহু, পৃষ্ঠা-৪০)

মূলত শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী পৃথিবী বিখ্যাত অধিকাংশ মুহাদ্দিসের হাদীসের সমালোচনা করেছেন এবং এ সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি হাদীসশাস্ত্রের কোনো মূলনীতিরও তোয়াক্কা করেননি। বড় বড় মুহাদ্দিসগণ যে সমস্ত হাদীসকে সহীহ বলেছেন, সেগুলোকে তিনি যয়ীফ বলেছেন, আবার তাঁরা যেটাকে যয়ীফ বলেছেন, তিনি নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সেগুলোকে সহীহ বলেছেন।

শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী একটি হাদীসকে এক কিতাবে সহীহ বলেছে, অন্য কোথাও সেটিকে আবার যয়ীফ বলেছেন। এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা একটি-দুটি নয়। অসংখ্য হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি এ ধরনের স্ববিরোধিতার আশ্রয় নিয়েছে; অথচ ডা. জাকির নায়েক শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানীকে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মনে করে থাকেন। তিনি এমন ব্যক্তির হাদীসের ওপর নির্ভর করেছেন, যিনি হাদীস শাস্ত্রের কোনো মুহাদ্দিসকে তার সমালোচনা থেকে মুক্তি দেননি। এবং

হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর সুপ্রমাণিত কোনো সনদ নেই।

জালালুদ্দিন সূয়ূতী (রহ.) সম্পর্কে শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী লেখেন–

فيا عجبا للسيوطى كيف لم يخجل من تسويد كتابه الجامع الصغير بهذا الحديث

"কী আশ্চর্য! জালালুদ্দিন সূয়ূতী তাঁর জামে সগীরে কিভাবে এ হাদীস উল্লেখ করতে একটু লজ্জাবোধ করলেন না!

(সিলসিলাতুজ জয়িফা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৭৯)

তিনি জালালুদ্দিন সূয়ূতী (রহ.) সম্পর্কে আরও লেখেন–

وجعجع حوله السيوطى

অর্থাৎ জালালুদ্দিন সূয়ূতী (রহ.) হাঁকডাক ছেড়ে থাকেন।

[সিল-সিলাতুজ জয়িফা, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৮৯]

ইমাম হাকেম, ইমাম যাহাবী এবং আল্লামা মুনযিরি (রহ.) সম্পর্কে আলবানীর উক্তি–

নাসীরুদ্দিন আলবানীর দৃষ্টিতে একটা হাদিস সহীহ নয়, অথচ অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে সহীহ বলায় তিনি হাদীসের বিখ্যাত তিন মুহাদ্দিস ইমাম হাকেম, ইমাম যাহাবী ও ইমাম মুনযিরী (রহ.) সম্পর্কে বলেছেন,

قال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبى ! واقره المنذرى فى الترغيب ١٦٦/٣ وكل ذلك من اهمال التحقيق والاستسلام للتقليد، والا فكيف يمكن للمحقق ان يصح مثل هذا الاسناد

"হাকেম বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তাঁর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। ইমাম মুনযিরী (রহ.) "তারগীব ও তারহীব" নামক কিতাবে তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর এটি হয়েছে, তত্ত্ব-বিশ্লেষণের প্রতি উদাসীনতা, তাকলীদের প্রতি আত্মসমর্পণ (অন্ধানুকরণ), নতুবা একজন বিশ্লেষণধর্মী আলেম কিভাবে একে সহীহ বলতে পারেন।"

(সিলসিলাতুয যয়ীফা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৭৯)

হাফেয তাজুদ্দিন সুবকী (রহ.) সম্পর্কে নাসীরুদ্দিন আলবানী মন্তব্য করেছেন-

لكنه دافع عنه بوازع من التعصب المذهبى، لا فائدة كبرى من نقل كلامه وبيان مافيه من التعصب

মাযহাব অনুসরণের গোঁড়ামি তাঁকে প্ররোচিত করেছে। তাঁর কথা উল্লেখ করে এবং তাঁর গোঁড়ামির কথা আলোচনা করার মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো উপকারিতা নেই।

[সিল-সিলাতুয যয়িফা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৫]

☆ আবু নস্‌র তাজুদ্দিন আব্দুল ওহাব বিন আলী বিন আব্দুল কাফী (৭১৭হি.-৭৭১হি.)। তাজুদ্দিন সুবকি (রহ.) শায়খুল ইসলাম ও কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) তকিউদ্দীন সুবকি (রহ.)-এর ছেলে। তিনি বিখ্যাত কিছু কিতাব রচনা করেছেন-

আল-কাওয়াইদুল মুশতামিলা আলাল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ের, জামউল জাওয়ামে' ইত্যাদি।

(চলবে ইনশআল্লাহ)

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহা: আনোয়ার হোসাইন
পাথরঘাটা, বরগুনা।

জিজ্ঞাসা :

পূর্ব থেকে চালু মসজিদ পুনর্নির্মাণের সময় মসজিদের নিচতলা যেখানে পূর্বে ওয়াক্তি ও জুমু'আর নামায দীর্ঘদিন যাবৎ আদায় হয়েছে। এমন স্থানে মসজিদের আয়ের লক্ষ্যে কমিটির লোকজন মার্কেট করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং দোতলা থেকে নামাযের ব্যবস্থা করতে চায়। এটি নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে দ্বৈতমত বিরাজ করছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মসজিদটি সরকারি জায়গার ওপর নির্মিত। আমি এ বিষয়ে শরয়ী বিধান জানতে ইচ্ছুক।

সমাধান :

সরকারি জায়গায় কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারে কোনো প্রকার বাধা-নিষেধ ছাড়া নামায চালু হলে তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে যায়। এরূপ শরয়ী কোনো মসজিদ পুনর্নির্মাণকালে পূর্বের নামাযের জন্য ব্যবহৃত স্থানে মসজিদের স্বার্থে হলেও দোকান ইত্যাদি নির্মাণ করা বৈধ হয় না। এর বিপরীতে কমিটির সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার নেই। সিদ্ধান্ত দিলেও তা কার্যকর করা বৈধ হবে না। (ফাতাওয়া রহিমিয়া ৩/১৬২)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহা: ক্বারী আব্দুল মান্নান
পূর্বধলা, নেত্রকোনা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মসজিদের ফান্ডে কিছু টাকা ছিল। মসজিদ কমিটি সেই টাকা দিয়ে জমি বন্ধক রেখেছে এবং সেই জমি থেকে আয় হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত লভ্যাংশ দ্বারা মসজিদের কোনো কাজ করা যাবে কি না?

সমাধান :

মসজিদের টাকা দিয়ে জমি বন্ধক রাখা জায়েয নেই। উপরন্তু ওই বন্ধকি জমি থেকে কোনো প্রকার মুনাফা করা আরো মারাত্মক গুনাহ বিধায় অতীতের ভুলের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের তাওবা করতে হবে এবং উক্ত লভ্যাংশ জমিসহ বন্ধকদাতাকে ফেরত দিতে হবে। (আল বাহরুর রায়িক্ব ৫/৪২০, ফাতাওয়া দারুল উলুম ১৩/১৮৩)

প্রসঙ্গ : ইলম অর্জন

নিশাত জাহান
সোলমাইদ, বেপারীবাড়ী, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা : ১

সকল মুসলমানের জন্য কতটুকু কুরআন শরীফের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত অত্যাবশ্যক?

সমাধান : ১

(১) নামায শুদ্ধ হয় পরিমাণ কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা করা সকল মুসলমানের ওপর আবশ্যক। (কিফায়াতুল মুফতী ২/৩৬,)

জিজ্ঞাসা : ২

সকল মুসলমানের জন্য কতটুকু দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা ফরয? কুরআন-হাদীসের আলোকে সমাধান চাই।

সমাধান : ২

প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য এতটুকু ইলম শিক্ষা করা ফরয, যার দ্বারা সে তার ওপর আবশ্যকীয় আকাঈদ, ইবাদত, মু'আমালা মু'আশারা ইত্যাদিতে আল্লাহ তা'আলার অর্পিত বিধিনিষেধ অনুযায়ী আমল করতে পারে। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৪২, এমদাদুল আহকাম ১/২১৭)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

হাফেজ হাবিবুল্লাহ সিরাজী
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের গ্রামে এক হিন্দু লোকের জায়গায় গ্রামের মুসল্লিরা মিলে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেছে। জানার বিষয় হলো, উক্ত মসজিদে নামায আদায়ের শরয়ী বিধান কী? আর মসজিদটি ভেঙে দিলে কোনো গুনাহ হবে কি না?

সমাধান :

হিন্দুর অনুমতি ছাড়া তার জমিতে মসজিদটি নির্মাণ করে থাকলে তাতে নামায আদায় করা মাকরুহে তাহরীমী। মুসলমানদের জন্য কর্তব্য হবে তার সন্তুষ্টিতে ন্যায্য মূল্যে জায়গাটি ক্রয় করে নেওয়া অথবা মসজিদটি অন্যত্র স্থানান্তরিত করা। অন্যথায় সে আইনের

আশ্রয় নিয়ে মসজিদটি ভেঙে দেয়ার অধিকার রাখে। (রদ্দুল মুহতার ১/৩৮১)

প্রসঙ্গ : কবরস্থান

মুহা: আব্দুল কাদির
বনানী, ঢাকা-১২১২।

জিজ্ঞাসা :

আমরা ২ ভাই ১ বোন। বাল্যকাল থেকেই পিতৃহীন, মা জীবিত আছেন। দাদা আমাদের সহায়-সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। ১৯৬৮ সালের ২২ এপ্রিল দাদা মৃত্যুবরণ করেন। বাড়িতেই দাদাকে সমাহিত করা হয়। দাদার মৃত্যুর ৩ মাস পর দাদিও মৃত্যুবরণ করেন। দাদিকে একই স্থানে সমাহিত করা হয়। ১৯৬৮ সালের পর এই কবরস্থানে কবর দেওয়া বন্ধ করে দিই। সময়ের পরিবর্তনে বর্তমানে আমি কবরস্থানসংলগ্ন ২ কাঠা জমি বিক্রি করে পাশেই বিল্ডিংয়ের কাজ আরম্ভ করার ইচ্ছা করেছি। এমতাবস্থায় আমাদের দাদা-দাদীর শান্তির জন্য কবর দুটির জমি বিক্রি করে মসজিদের উন্নয়নের জন্য দান করা উত্তম হবে না কি যথাস্থানে বহাল রাখা উত্তম হবে।

সমাধান :

যেহেতু প্রশ্নোক্ত মালিকানাধীন কবরস্থানে ৪৫ বছর থেকে কোনো মাইয়্যিত দাফন করা হয়নি। তাই এর আগে কবরস্থ ব্যক্তিদের সব কিছু মাটি হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। বিধায় উক্ত জমি সমান করে যেকোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। এমনকি বিক্রি করে দাদা-দাদির ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্য মসজিদের উন্নয়নের জন্য দান করলেও তারা সওয়াব পাবেন। ওই জায়গাকে কবরস্থান হিসাবে বাকি রাখাও জরুরি নয়। (রদ্দুল মুহতার ২/২৩৩, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৬/১৯৭)

প্রসঙ্গ : আকীদা

মুহা: হাবীব
মিরপুর-১, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা:

(ক) মুসলমান হয়ে তাওরাত-ইঞ্জিল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পড়া যাবে কি না? বিস্তারিত দলিলসহ জানতে চাই।

(খ) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশ্বনবী কি নূরের তৈরি নবী? আমি এক হুজুর থেকে শুনেছি যে, আমাদের নবী মাটি এবং নূর উভয়ের তৈরি।

(গ) আমরা অনেক সময় বলি হুজুর পুর নূর (সা.)-এ কথা আমাদের বলা কি ঠিক হবে?

সমাধান :

(ক) তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদি স্ব স্ব রাসূলদের ওপর নাযিলকৃত কিতাব। মানবজাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত কিতাবাদী ছাড়াও যুগে যুগে আরো অনেক কিতাব নাযিল করে ছিলেন। যেগুলোর বিধি-বিধান মেনে চলা তাদের ওপর ফরয ছিল। রাসূল (সা.) নবুওয়াত লাভ এবং মহাগ্রন্থ পবিত্র আল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর বিধান রহিত করে দেয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও ওই সব আসমানী কিতাব ও এর মধ্যে আনীত বিধান এবং ধারকবাহক নবীগণ সত্য এ কথার ওপর ঈমান রাখা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। কতিপয় অসাধু পাদ্রি ও ধর্মগুরুদের হস্তক্ষেপে এবং কালের আবর্তে ক্রমান্বয়ে উক্ত কিতাবগুলোর বিধানে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে বর্তমান সময়ে ওই কিতাবগুলো নামে মাত্র আসমানী কিতাব হলেও বাস্তাবে তা কাল্পনিক কিচ্ছা-কাহিনী, ইতিহাস এবং কুপ্রবৃত্তিতাড়িত কিছু গর্হিত বিধানের সমষ্টিগত গ্রন্থে রূপ নিয়েছে। সুতরাং সাধারণ মুসলমানের জন্য ওইসব গ্রন্থ পড়া বৈধ হবে না। প্রয়োজন সাপেক্ষে অভিজ্ঞ দ্বীনদার আলেমগণ গবেষণার জন্য পড়তে পারবেন। (সূরা বাকারা-৭৯, রদ্দুল মুহতার ১/৩৫১)

(খ-গ) কুরআন ও হাদীস শরীফের অকাট্য দলিল দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, রাসূল (সা.) বাশার তথা মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত। আর মানবজাতির তৈরিতে মূল উপাদান হলো মাটি। এ হিসেবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মাটি দ্বারাই সৃষ্টি। কিন্তু কুরআন ও হাদীস শরীফের বিভিন্ন জায়গায় রাসূল (সা.)-কে আত্মা, হেদায়াত ইত্যাদির দিকে লক্ষ করে নূর বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা-বিশ্বাস হলো, রাসূল (সা.) জন্মগত দিক দিয়ে মানব তথা মাটিরই সৃষ্টি। আর হেদায়াতের দিক দিয়ে নূর কিন্তু নূরের তৈরি নন। এমনিভাবে নূর এবং মাটি উভয়ের তৈরিও নন। এ আক্বীদা বিশ্বাস ঠিক রেখে রাসূল (সা.)-কে হুজুর পুর নূর (সা.) বলাও আপত্তিকর নয়। (সূরা কাহাফ-১১০, বুখারী শরীফ ১/৫৮)

প্রসঙ্গ: জন্মনিয়ন্ত্রণ

আব্দুল মালেক
সিংগাইর, মানিকগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা : ১.

জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কী? বৈধতার কোনো পথ আছে কি না? যে কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ সে কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ না করে অন্য কারণে যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ করে তাহলে তার হুকুম কী? যেমন কেউ পরিবারের অজান্তে

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। পারিবারকে দুই বছর পর জানানোর ইচ্ছা আছে। এখন যদি সন্তান নেয় তাহলে পরিবারের কাছে সন্তানসহ স্ত্রীকে নিয়ে গেলে সমাজ হেয়প্রতিপন্ন করবে।

সমাধান : ১.

স্থায়ীভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ কোনো অবস্থাতেই শরীয়ত অনুমোদিত নয়। তবে স্বাস্থ্যগত কারণে অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার গর্ভধারণ আশংকাজনক বলে অভিমত প্রকাশ করলে বা পূর্বের বাচ্চার স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার প্রবল আশংকা দেখা দিলে বা এ ধরনের শরীয়তসম্মত কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে সাময়িকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। আর প্রশ্নে বর্ণিত কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা সম্পূর্ণ হারাম হবে। (ফতাওয়ায়ে রহীমিয়া ২/২৩৩)

প্রসঙ্গ : আযান

জিজ্ঞাসা: ২.

আযানের পূর্বে কিছু মসজিদে الصلاة والسلام عليك يا رسول الله বলতে শোনা যায় শরীয়তে এর হুকুম কী?

সমাধান : ২

আযান শেষে দরূদ শরীফ পড়ার নির্দেশ রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদীস শরীফের মাধ্যমে দিয়েছেন। আযানের পূর্বে দরূদ শরীফ পড়ার কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ নেই। তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ হতে অদ্যবধি আযানের পূর্বে দরূদ শরীফ পড়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিধায় আযানের পূর্বে সালাত ও সালামের প্রথাটি বর্জনীয়। (মুসলিম শরীফ ১/১৬৬, আহসানুল ফতাওয়া ১/৩৬৮)

প্রসঙ্গ : কবরে সেজদা করা

জিজ্ঞাসা : ৩.

কবরে সেজদা/কায়মনোবাক্যে মাজারের মৃত ওলী-আল্লাহর কাছে বিভিন্ন প্রয়োজন উপস্থাপন করা এবং চাওয়ার হুকুম কী?

সমাধান : ৩.

সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কবরে সেজদা করা হারাম। আর কবরবাসীর কাছে কোনো কিছু চাওয়া শিরকের অন্তর্ভুক্ত। (শরহে ফিকহিল আকবর ২৩০, ফতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১/১২২, মিশকাতুল মাসাবীহ ৬৯, মেরকাতুল মাফাতীহ ২/৩৮৯)

প্রসঙ্গ : পর্দা

আব্দুল কাদির
নারায়ণগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

একজন মহিলা পর্দার সাথে আশপাশের মহল্লায় দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করেন এবং দ্বীনি কিছু কথাবার্তা বলে যিকির-আযকার করে মোনাজাত করে শেষ করেন।

উক্ত কাজ কুরআন ও হাদীসের আলোকে সঠিক কি না জানতে চাই।

সমাধান :

মহিলাদের ঘরে অবস্থান করা আল্লাহর পাকের নির্দেশ। পর্দার সাথে বের হলেও এ নির্দেশের অমান্য হয়। তাই বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া দাওয়াত, তাবলীগ ও তালিমের জন্য পর্দার সাথেও বের হওয়া নিষিদ্ধ। (সূরায়ে আহযাব ৩৩, সহীহে বুখারী ১/১২০, আল বাহরুর রায়েক ১/৬২৮, আহসানুল ফতাওয়া ৮/৫৮)

প্রসঙ্গ : নামায

হাসান আলী
রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক ব্যক্তির দীর্ঘদিনের নামায ছুটে যাওয়ার পর তার কাজা সম্পাদন করতে করতে ছয় ওয়াক্তের কমে চলে আসে। ওই ব্যক্তি পুনরায় সাহেবে তারতীব হবে কি না? এবং অবশিষ্ট নামাযগুলোর ক্ষেত্রে সাহেবের তারতীবের হুকুম পুনর্বহাল হবে কি না?

সমাধান :

ওই ব্যক্তি অবশিষ্ট নামাযের কাজা সম্পাদন না করা পর্যন্ত বিশুদ্ধমতানুসারে সাহেবে তারতীব হবে না। তাই অবশিষ্ট নামাযগুলোর ক্ষেত্রে সাহেবে তারতীবের হুকুম পুনর্বহাল হবে না। (ফতাওয়া কাজী খাঁ ১/৫৫, রাদ্দুল মুহতার ২/৭০)

প্রসঙ্গ : সুদ

জিজ্ঞাসা :

সুদী ব্যাংকে টাকা লেনদেন করলে সুদ কিভাবে হয়? তা দলিলসহ বিস্তারিত জানতে চাই। কেউ কেউ বলেন, সুদ হওয়ার জন্য যে উসূল قدر مع الجنس তা নাকি ব্যাংকে টাকা লেনদেনের সূরতে পাওয়া যায় না। তাই এতে সুদ হবে কেন?

সমাধান :

اشياء قدر مع الجنس এর মূলনীতিটি ربوبيه এর ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যাংকে টাকা লেনদেনের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। বরং ব্যাংকে টাকা রাখা মূলত ব্যাংককে করজ দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মুনাফা নেওয়া হলে كل قرض جر نفعا فهو ربا এই মূলনীতিতে সুদ হিসেবে গণ্য হবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/১৮০, আদ্দুররুল মুখতার মা'আররাদ ৫/১৬৬, ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশাত ওয়া তিজারাত ১১৫, জাওয়াহেরুল ফিকহ ৩/৩৩)

ইসলামে মানবাধিকার-৩

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

৯. ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার :

পবিত্র কুরআন মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দিয়ে সকল মানুষকে ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার দিয়েছে। কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াত থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয়, পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যই হলো মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় তথা প্রতিটি স্তরে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। যাতে ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো একজন ব্যক্তিও ন্যায়বিচারের অভাবে জুলুম, অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার না হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোনো বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ করো, তখন মীমাংসা করো ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদের সদোপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।" (আননিসা ৫৮)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

"নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি। যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফায়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না।" (আননিসা ১০৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সংগত সাক্ষ্যদান করো, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চেয়ে বেশি। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কেই অবগত।" (আননিসা ১৩৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করো এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো, যা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।" (মায়েদা ৮)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লেখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমসমূহের বিনিময়ে সমান জখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালেম।" (মায়েদা ৪৫)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"এতীমদের সম্পদের কাছে যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ করো ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অধিক কষ্ট দিই না। যখন তোমরা কথা বলো তখন সুবিচার করো, যদিও সে আত্মীয়ও হয়।" (আনআম ১৫২)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যে, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।" (নাহাল ৯০)

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহ ছাড়াও আরো বহু আয়াত এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইসলামে অন্যায় অবিচারের কোনো স্থান নেই। বরং সকল মানুষ ন্যায় বিচার প্রাপ্তির অধিকার রাখে। এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্যই পবিত্র কুরআনে বার বার ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
"আল-আবরার" এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ

চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩